যুযুধান

বুদ্ধদেব গুহ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭২ ।। মে ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
বিভূতি সেনগুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৭, হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা ৯, জ্ঞানোদয় প্রেসে মুদ্রিত



युयुधान

যুযুধান

শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু



এখন রাত সাতটা। যুযুধান মিনিবাসের সামনের দিকের জানালার পাশে বসেছিলো। বাসটা এসে সুরেন বাঁড়ুয্যে রোড আর চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়ালো। অন্যদিনের তুলনাতে আজ তাড়াতাড়িই বেরিয়েছিলো কিন্তু কলেজ স্ট্রীটে যাওয়াতেই দেরী হয়ে গেলো।

বাসটা প্রায় ভর্তিই বলতে গেলে! তবুও দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে ভ্যাপসা গরম। প্রচণ্ড মিশ্র আওয়াজ উঠছে চারদিক থেকে। সে আওয়াজের 'ডেসিবেলে'-এর হিসেব কষা মুশকিল। মাথায় মধ্যে ঝম্-ঝম্ করে। মনে হয়, বদ্ধ কালা হয়ে যেতে আর বেশিদিন নেই। ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতাও বোধহয় চিরদিনের মতোই নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো ব্যাপারেই কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারে না আজকাল। ফড়িং-এর মতো হয়ে গেছে মন।

এই যে যুযু! কেমন আচিস্?

যুযু চমকে উঠে প্রচণ্ড শোর-এর মধ্যে সেই বিশেষ বাক্যটি যেদিক থেকে উৎসারিত হলো মনঃসংযোগ করে সেদিকে তাকালো। তাকিয়েও মানুষটিকে চিনতে পারলো না। অথচ ওর নাম ধরেই ডাকলেন ভদ্র-লোক।

কী রে শালা! চিনতেই যে পাচছিস্ না! তুই অবশ্য একাই নোস। কোনো শালাই আমাকে আর চিনতে পারে না আজকাল।

চিনতে পারলো এবারে যুযুধান। তার স্কুলের বন্ধু সোম ব্যানার্জী। অবিকল একই রকম চেহারা আছে 'সোম'-এর। লম্বা, ছিপছিপে। কণ্ঠার হাড়টা উঁচু। কাটা কাটা নাক চিবুক। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ।

ঠিক সেইরকমই দুটি হাত দুদিকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলার ভঙ্গিটিও অবিকল আছে। বদলের মধ্যে শুধু গায়ের রঙটাই কালো হয়ে গেছে। আর রোগাও হয়েছে একটু। কতদিন পরে দেখা।

সোম না?

অ্যাই তো! হেসে বললো সোম। চিনেচিস তাহলে! বাঃ! ওল্ড ইজ গোল্ড। কি করিস এখন? শুনেছিলাম, ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেণ্টে ছিলি?

শুনেছিলি ঠিকই। এখনও সেখানেই আছি।

বেড়ে আছিস।

তুই? তুই কোথায় আছিস এখন?

কোথায় আছি মানে? কোন এলাকাতে থাকি? না, কাজের থাকা-না-থাকার কথা বলছিস?

দুইই।

ইনকামট্যাক্সে ছিলাম। ভারত সরকারের আপিসে।

ছিলি মানে?

ছিলাম মানে, চাকরি চলে গেছে। মাস ছয়েক হলো। এখন জব্-লেস্।

কেন? কী হলো? হঠাৎ?

ফিফ্‌টি-সিক্স জে। হিঃ হিঃ! গিলোটিন।

সেটা আবার কি?

সে অনেক কথা। তোর মিনি ছেড়ে দিচ্ছে।

সোম, তুই কোথায় থাকিস?

কথাটা জিগ্যেস করেই যুযুর মনে হলো ওকে ওর সহযাত্রীরা খারাপ ভাবতে পারেন। সরকারী চাকরি যার চলে যায় তার সঙ্গে হৃদ্যতা রাখাটা কি ভালো চোখে দেখেন কেউই? কিন্তু ততক্ষণে জিগ্যেস করে ফেলেছে। তাছাড়া চুরি করে বা ঘুষ খেয়ে চাকরি গেলে

কেউ চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে চাকরি চলে-যাওয়া নিয়ে ইয়ার্কি করতে পারে না। পালিয়েই বেড়ায়। যুযু ওকে যতটুকু জানে তাতে মনে হয় চাকরি গিয়ে থাকলে ফাঁকি মারা/বা ইনএফিসিয়েন্সির জন্যে যেতে পারে, ঘুষ খাওয়ার জন্যে নয়। ঘুষ হজম করতে হলে মদ হজম করার চেয়েও শক্তপোক্ত লিভারের দরকার। ভণ্ডামিরও।

কুঁদঘাট।

আগে যতীন দাস রোডে থাকতি না?

সে তো কবে। মামাবাড়ি ছিলো। তারপর গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার। এখন কুঁদঘাট। আর তুই?

সেখানেই।

কোনখানে?

ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতেই।

গদাধর বোস লেন না কী যেন নাম ছিলো গলিটার নারে?

যুযু হেসে বললে, তোর দেখছি মনে আছে এখনও?

থাকবে না? মাসীমা কত আদর করতেন। পুলি-পিঠে, মোচার চপ। ভুলে যাবো? এমন নিমকহারাম নই। মাসীমা কেমন আছেন? সোম শুধোলো।

নেই।

নেই? সে কি রে! ভারী দুঃখ হলো রে শুনে। লাস্ট অব দ্যা মোহিকানস্। ঐ জেনারেশানের মা-মাসীরা আর হবে না, বুঝেচিস্। তা, কতদিন গত হলেন?

পাঁচ বছর।

রিয়্যালী। ভেরী ব্যাড ··

যুযু, আমার মাও লং এগো গান্। তবে আমার এই বেইজ্জতির আগেই টেঁসেছেন এই যা। নইলে মায়ের জন্যে বড় দুঃখ পেতাম

যুযু কী যেন আরও বলতে গেলো তারপর ; কিন্তু মিনির ডিজেলের এঞ্জিন ঘড়ঘড় করে উঠলো।

যুযু হাত তুলে বললো, আসিস একদিন। বলেই বাড়ির নম্বরটা মনে করিয়ে দিলো।

সোম বললো, সে কি রে ? তুই তো আজীব আদমী হচ্ছিস শালা। ফিফ্‌টি-সিক্স জে-কে কেউ বাড়িতে ডাকে ? যখন চাকরি ছিলো সারা পৃথিবীই তেলাতো। এর শালার কেস করে দাও, তার ভায়রাভাইয়ের, কারো পিসতুতো ভাইয়ের চাকরি, ছেলের আর্টিকেল্ড ক্লার্কশিপ, কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বলে। সবসময়ই জী জী ! স্যার ! স্যার। আর আজকে হঠাৎ পথে দেখলে আঁতকে ওঠে। এমনই ব্যবহার করে যেন আমি কোনো মার্ডারার, রেপি······

বাসটা ছেড়ে দিলো।

বাসটা ছেড়ে দিতেই হাওয়া লাগলো যুযুর গায়ে। ঐ দমবন্ধ ভাবটা কেটে গেলো। 'শোর'-এর তারায়-চড়ানো জটবাঁধা শব্দগুলো জমাট বেঁধে ছিলো আধো-আধো হয়ে ধুলোতে বালিতে কালিতে ডিজেল পেট্রলের ধুয়োতে, এখন হঠাৎ হাওয়া পাওয়াতে আলতো হয়ে উড়ে যেতে লাগলো সেগুলো। সরে সরে গা ছাড়তে লাগলো।

যুযুর পাশে-বসা অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, ভারী মজার লোক কিন্তু আপনার বন্ধু।

মজার ? যুযু বললো। তাছাড়া বন্ধুই যে, তা জানলেন কি করে ? যুযু অস্বস্তিতে পড়ে বললো।

এই ভয়ই তো করছিলো !

কথাবার্তা শুনেই বুঝলাম। তাছাড়া আমি তো ওঁকে চিনি। আমিও ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টেই আছি।

তাই ?

আপনি কি সোম-এর কলিগ্ ছিলেন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না, ঠিক কলিগ্ নই! ওঁর এক ধাপ নীচে কাজ করতাম। ওঁর চাকরি থাকলে উনি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশানার হয়ে যেতেন এতোদিনে।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশানার মানে ?

ঐ যাঁরা ক্লাস ওয়ান অফিসার তাঁদের এখন নতুন নাম হলো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশানার।

ফিফ্‌টি-সিক্স জে টি কি জিনিস মশাই ?

সে আর বলবেন না। মিঃ ব্যানার্জীর কাছ থেকেই শুনবেন। আপনার বন্ধুকে আমি ভালো করেই চিনি। ওঁর প্রতি সত্যিই খুব অবিচার করা হয়েছে। তারপর থেকেই কেমন যেন পাগলাটেই হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আয়কর ভবনেও আসেন। ইংরিজি-বাংলাতে খুবই ভালো ছিলেন। কিন্তু অ্যাকাউন্টস, ট্যাক্স এসব বুঝতেন না মোটেই। আদৌ পছন্দও করতেন না। অ্যান্থ্রোপলজীতে ফার্স্ট ক্লাস এম এ। পেটের দায়ে ট্যাক্সো করতে এসেছিলেন। আমাদের দেশেই এ সম্ভব।

সেটা ঠিক। স্কুলেও সোম ইংরিজিতে, শুধু ইংরিজিই বা বলব কেন, বাংলাতেও খুবই ভালো ছিলো। স্কুলের পরে তো যোগাযোগই ছিন্ন হয়ে গেছিলো। ও সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ বা ঐদিকের কোনো কলেজে ভর্তি হয়।

আর আপনি ?

আশুতোষ। আমাদের পাড়ার মধ্যেই তো প্রায়।

যুযু বললো, সোম অনেস্ট ছিলো ?

প্রশ্নটা করেই বুঝলো যে, এমন প্রশ্ন করাটা উচিত হলো না আদৌ।

কিন্তু একটুও এমবারাসড্ না হয়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ যুযুর মুখের

দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, হাণ্ড্রেড্ পারসেন্ট। ওঁর সঙ্গে আবারও দেখা হলে বলবেন আমার কথা।

কী বলব ?

বলবেন যে ওঁর ডিপার্টমেন্টেরই একজন এই কথা বলেছেন।

কোন্ কথা ?

ঐ তো! যে, উনি নির্দোষ। উনি হাণ্ড্রেড-পারসেন্ট অনেস্ট। ওঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

বলব। কিন্তু আপনার নাম কি বলব ? যদি অবশ্য আদৌ ওর-সঙ্গে আবারও দেখা হয়।

আমার নাম ? বলবেন, অনাথ। আমি ওঁর পেশকার ছিলাম উনি যখন প্রথম চাকরিতে ঢোকেন। বলবেন, "ক্যালকুলেটর অনাথ" বা "অনাথ ক্যালকুলেটর"।

"ক্যালকুলেটর" কেন ? যুযু হেসে শুধোলো।

আমি খুব তাড়াতাড়ি যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারতাম আর ট্যাক্স ক্যালকুলেশানও ঝড়ের মতো করতে পারতাম। আগে ট্যাক্স ক্যালকুলেশানে অনেক ঝকমারিও তো ছিলো! আর্নড্-ইনকাম, আন্-আর্নড্ ইনকাম। এই সারচার্জ, সেই সারচার্জ। কত্ত ক্যাকড়া। তাই উনি আমাকে নাম দিয়েছিলেন "ক্যালকুলেটর অনাথ"। আসল পদবী ঘোষ।

আর আপনাকে চিনতেই পারলো না আজ ?

আমিই তো মাথা নীচু করে ছিলাম। দেখতে পেলে তো চিনবেন।

আপনার মাথা নীচু করার কি ছিলো অনাথবাবু ?

এই নাথহীন দেশে চতুর্দিকে অহরহই যে অন্যায় ঘটছে তার প্রতিকারের ক্ষমতা তো দাদা আপনার আমার নেই। আমার মতো অনাথের তো নেই-ই! প্রতিবিধানের ক্ষমতা নেই অবশ্যই কিন্তু লজ্জাবোধ তো এখনও মরেনি। বিপদ তো সেখানেই। ব্যক্তিগত

লজ্জার কথা বলছি না। সমষ্টিগত, সামাজিক ; রাষ্ট্রিক সব কাঁড়ি কাঁড়ি লজ্জা।

বাঃ। আপনি তো খুব ভালো কথা বলেন।

অনাথবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, আমি পার্টি করি। মানে, করতাম। আবৃত্তির ক্লাস এবং বাংলা বক্তৃতার ক্লাসও করতে হয়েছে একসময় রীতিমতো। তাই·····। আসলে কী আর ভালো জানি। কিছু কিছু শব্দ ঐ····হয়ে যায় আর কী!

জগুবাবুর বাজার! জগুবাবুর বাজার!

কনডাকৃটর হাঁকলো।

আমি এবার নামবো। যুযু বললো।

আচ্ছা দাদা। নমস্কার। আপনার নাম তো যুযু রায়। তাই বললেন না?

যুযুধান রায়।

এ রকম অদ্ভুত নাম?

ছেলেবেলায় আমার পিঠোপিঠি এক ভাই ও এক বোনের সঙ্গে বালিশ পেটাপেটি করতাম সব সময়, তাই মা নাম দিয়েছিলেন যুযুধান।

অনাথ ক্যালকুলেটর হেসে ফেললেন। ভারী রসিক ছিলেন তো আপনার মা! তবু ছেলেবেলা বলে আমাদের কিছু একটা ছিলো। কী বলেন? আমাদের ছেলেমেয়েরা তো ছেলেবেলা কাকে বলে তা জানলোই না।

তা ঠিক। মিনি থেকে নামতে নামতে যুযু বললো।

মিনি থেকে নেমে নিজের মনেই বললো, সত্যিই ছেলেবেলা বলে আমাদের মস্ত একটা প্রাপ্তি ছিলো। সে নিজে অবশ্য অবিবাহিত বলে নিজের ছেলেমেয়েদের এ বাবদের তফাৎটা বোঝবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের ছেলেমেদের দিয়ে বিলক্ষণই বুঝেছে।

গলিতে ঢুকে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো যুযুধান। সারা রাত সাইক্লোনিক ঝড়ের পরও বিকেলে এদিকে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এমনিতে অপরিচ্ছন্ন মলিন গলিটাকে ধোয়ামোছা তকতকে বলে মনে হচ্ছে আজকে। তারই মধ্যে পড়ে আছে দেওয়াল ঘেঁষে একটি বেড়ালের মরা বাচ্চা। সাদা কালো। আর একটি শালিখ। হলুদ-সিঁটিয়ে-যাওয়া পা দুটি তার। কালকের সাইক্লোনের বলি এরা। এক নিথর সমর্পণের ভঙ্গীতে শুয়ে আছে বেড়াল-বাচ্চাটি। আর বুড়ো শালিখটা এমনই করে পা মুড়ে ঘাড় গুঁজে আছে যেন উড়ে যাবে এখুনি।

কড়া নাড়লো যুযু।

এই ছোট্ট পাড়াতে, এই গলিতে এখনও আধুনিকতা পুরোপুরি আসেনি। অবশ্য আজকালকার আধুনিকতা আসে অর্থর হাত ধরে। অর্থ না থাকাও একটা বড় কারণ। সব প্রতিবেশী মিলেই উগ্র 'আধুনিকতাকে' ঠেকিয়ে রেখেছেন তাঁদের দুর্বল হাতে। এ পাড়ায় এখনও প্রতি বৃহস্পতিবারে শির-বের-করা হাতে শাঁখ বাজিয়ে লক্ষ্মী পুজো হয়। লক্ষ্মীর কৃপা কেউই পাননি এখনও প্রতিবেশীরা। পাবার আশু সম্ভাবনাও নেই কোনো। সকলের অবস্থাই দিনে দিনে দরিদ্রতর হচ্ছে এই গগন-ছোঁয়া বাজার দর-এ। গুজরাটী, মাড়োয়ারী আর সর্দারজীদের দালালেরা প্রায়ই গলির প্রায় সব ক'টা বাড়িতে এসেই খুবই লোভনীয় দর দিয়ে যাচ্ছে। এতো টাকা এক সঙ্গে এঁরা কেউই চোখে দেখেননি। সব বাড়ি ভেঙে মালটিস্টোরিড বাড়ি হবে। এই প্রস্তাব।

কোনো প্রতিবেশীর মায়ের ক্যানসার। কারো অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ে দিতে হবে। কারো ছেলে সর্বসুখের দেশ আমেরিকাতে গিয়ে এম. বি. এ. করে আসবে বলে ঝুঁকে পড়েছে। কারো বা বড় আদরের একমাত্র বিবাহিত মেয়ে বিয়ের তিনমাস পরে শিক্ষিত স্বামীর বিকৃত

ব্যবহারে বাড়ি ফিরে এসেছে। তাই প্রত্যেকেরই টাকার খুব দরকার।

মরণোন্মুখ সার সার মানুষের মৃত্যুর অপেক্ষায় এই শহরেরই অলিতে-গলিতে একদিন শকুনেরা যেমন সার দিয়ে বসে থাকতো আজও তেমনি পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ীরা গরিব বাঙালিদের শহর থেকে উৎখাত করবে বলে ওৎ পেতে আছে। প্রত্যেকের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে। দেখছে, নাড়ির গতি। টাকা নাও মুঠো মুঠো। আর সোনার ডিম দেওয়া হাঁসকে বেচে দিয়ে চলে যাও।

কিন্তু তবুও মালটিস্টোরি-ওয়ালাদের হাত থেকে এখনও এই জরাজীর্ণ বাড়ির ঐতিহ্যময় গলি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে কোনো-ক্রমে। লক্ষ্মীর কৃপা ক্বচিৎ যে দু-একজন পেয়েছেন শর্ট্‌কাট্‌ পথে, তাঁরা এ পাড়া ছেড়ে তাঁদের ভি. সি. আর. আর মারুতি গাড়ি কিনে চলে গেছেন অন্যত্র।

এ গলিতে বড়লোকি ঢোকা এখনও বড় কঠিন। কারণ, টানা রিকশা, দ্বি-চক্রযান এবং অটো ছাড়া আর কোনো যানবাহনই এতে ঢুকতেই পারে না। এমনই সরু গলি এ। গলির প্রতি-বারান্দাতে এখনও কাচা শাড়ি, শায়া এবং লুঙি-গামছা ঝুলোনোকে 'অসভ্যতা' বলে কেউই মনে করেন না।

বুড়োরা রকে বসে সকাল-সন্ধেতে এখনও রাজা-উজির মারেন। চলে-যাওয়া সোনার দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেন। বাধা কেউই দেন না। এপাড়া পুরোনো দিনের কলকাতার স্মৃতি বহন করে চলেছে। মেয়েরা পূর্ণ বা বিজলী বা ইন্দিরাতে এখনও ভালো বাংলা ছবি এলে ম্যাটিনী শো-তে সে ছবি পাছা-পেড়ে শাড়ি পরে গিয়ে দেখে আসেন। এ পাড়ার মেয়েরা রোজ চুলে তেল দেন। বিবাহিতারা সিঁথিতে সিঁদুর। শোবার আগে চুল আঁচড়িয়ে শুতে যান তাঁরা। ছেলেরা এবং বুড়োরা এখনও কেউ কেউ গড়গড়া খান। প্রায় সকলেই

ধুতি পরেন ক্রিয়া-কর্মর দিনে। বাংলা বই ও বাঙালী সাহিত্যিকের মর্যাদা এখনও আছে এখানে। এবং কী আশ্চর্য! বাংলাতে চিঠি লিখতেও পারেন এঁরা সকলেই। বিজয়ায় ও নববর্ষে দূর-প্রবাসের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়মিত চিঠি লেখেন সবাই। ছেলেমেয়েরাও কথা বলে বাংলাতেই।

কীর্তন, পুরাতনী, রবীন্দ্রসঙ্গীতই এখনও এখানে একমাত্র গান। দিশী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও। ভজন। অনুপ জালোটা আর পঙ্কজ উধাস এখানের সকলকে উদাসী করেননি এখনও।

প্রায় শুকিয়ে-যাওয়া বাঙালী জাতের একটি সরু সোঁতা, সরু ঘোলা-জলের টলির-নালার পাশে এখানে এখনও বয়ে যাচ্ছে। তেলাপোকার মতো শক্ত প্রাণ এই গলির মানুষদের। বাসে-ট্রামে, ঘামে-লোডশেডিংএ, প্রোটিন-ডেফিসিয়েন্সীতে মরতে মরতেও না মরে এবং কিছুতেই মরবো না এমন পণ করেই এখনও বেঁচে আছেন এঁরা।

পচার মা দরজা খুললো। ছোট ভাই অমলের আড়াই বছরের ছেলে শাশা "জেতু জেতু" করে দৌড়ে এলো টাল্‌মাটাল্ পায়ে। যুযু পকেট থেকে দুটি লজেন্স বের করে দিলো তাকে। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে ছোট ভাই অমলের বৌ শ্রীলা, ঘোমটা মাথায় কাছে দাঁড়িয়ে বললো, দাদা, আপনার চিঠি।

হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারলো যুযু কার লেখা চিঠি এ। শ্রীলাও জানে কার চিঠি। শ্রীলার দূরসম্পর্কের দিদি হয় যুনী। দিল্লী থেকে লিখেছে। শ্রীলার সঙ্গে অমলের বিয়ের সম্বন্ধে যুনীই করেছিলো।

গা ধোয়ার পর লুঙি গেঞ্জী পরে নিজের ইজিচেয়ারে এসে বসলো যুযু। পচার মা চা আর হাতে-গড়া দুটি রুটি আর আলুর তরকারি নিয়ে এলো।

যুযু বললো, ওগুলো নিয়ে যাও। শুধু চা-টা রেখে যাও পচার মা। একেবারেই খেয়ে নেবো রাতে। অমল কি ফিরেছে অফিস থেকে ?

ছোড়দা তো ফিরেই ক্লাবে গেছে। ফিরতে দেরি হবে। তুমি খেয়ে নিলে বোলো। তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। বৌদিও তোমার সঙ্গে খেয়ে নেবে বলেছে। বৌদি বলেই রেখেছে আমাকে।

চা খাওয়া হয়ে গেলে, চায়ের কাপটা শেষ করে এবারে শ্রীলার দেওয়া চিঠিটা খুললো যুযু।

দরিয়াগঞ্জ
পুরোনো দিল্লী

যুযুদা,

কাগজে দেখলাম তোমাদের কলকাতায় সাইক্লোন আসছে। সত্যিই এলে কী হবে জানি না। তোমাদের ও তোমাদের পাড়ার বাড়িগুলো যেমন পুরোনো, তাতে বাড়িঘর সব উড়ে না যায়। তেমন সাইক্লোন তো কলকাতায় কখনওই আসেনি। তাই ভয় করে।

আগামী শনিবার তোমার জন্মদিন। তোমার জন্যে পার্সেল করে একটি কলম পাঠিয়েছি। পোস্ট-অফিসে খোঁজ কোরো। যবন কাস্টমস্-এর দোকান থেকে আমার কথামতো নিয়ে এসেছিলো। ছাই-রঙা একটি জার্মান কলম। খুব সরু নিব। তোমার পছন্দ হবে হয়তো।

তোমার চল্লিশ হবে। তোমার একটি করে বছর বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে পড়ে যায় যে আমারও বাড়লো একটি। জন্ম তো একই মাসে। মাত্র ক'দিনের তো ব্যবধান। আমরা দুজনেই কর্কট রাশির। তাই কি এতো ভাব আমাদের ? আমার পঁয়ত্রিশ হবে তিরিশে জুন।

কী করে যে দিনগুলো চলে গেলো ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যাই। দাদা এবং মাসীমার চলে যাওয়ারও পাঁচ বছর হয়ে গেলো।

জন্মদিনে কি আমার কথা মনে করো যুযুদা একটিবারও? তোমার নিজের বাড়িতেও তোমার জন্মদিনের খোঁজ কেউই রাখে না। শ্রীলাকে আমি বলেছিলাম যে তোমাকে পায়েস যেন রেঁধে দেয় একটু। তা তুমিই তো তাকে ভুজুং দিলে, বললে, যুনী জানে না কবে জন্মদিন। তোমার জন্মদিন সাতাশে জুন নয়। কবে যে, সে কথাও তাকে বললে না। সে বেচারীই বা কী করে বলো।

কেমন আছো? তোমার সঙ্গে চার বছর দেখা হয় না। চার বছর। এ কথা বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না। দেখা কি মরার আগে আবার হবে? তুমিও আসো না দিল্লীতে, আমিও যাই না কল-কাতাতে। একটি ফোটো পাঠাতেও কি পারো না? সম্প্রতি তোলা? অমলের আর শ্রীলার বিয়েতে যখন গেছিলাম তখন ওদের বিয়ের ছবির মধ্যে (অমলের পাড়ার বন্ধু গেনু তুলেছিলো) আমার আর তোমার কটি ছবি উঠেছিলো। লজ্জায় অমল অথবা গেনুকেও বলতে পারিনি এনলার্জ করিয়ে দেওয়ার কথা। পোস্টকার্ড সাইজের ফোটোগুলি আলমারিতে আমার ড্রয়ারে রাখা আছে। বাড়ি যখন একেবারে খালি থাকে তখন বিছানার উপরে খুলে মেলে দেখি। তুমি তো দিনে দিনে আরোও ছেলেমানুষ হচ্ছো। আর আয়নার সামনে আমার দাঁড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। এমনই বুড়ি-বুড়ি হয়ে যাচ্ছে চেহারাটা।

জানো আমার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে? এই জীবনটা এমনি করেই কি শেষ হয়ে যাবে? কিছু কি করা যায় না এখনও? তুমি তো ক্লাস-ওয়ান অফিসার। বলেছিলে, এবার বদলী করলে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে। বদলী নিয়ে চলে এসো না দিল্লী! বেশ আমার সঙ্গেই থাকবে। যবন কিছু মনে করবে না। যবন

একটি পাঞ্জাবী মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম অনুরাধা। যবন ভাকে তাকে "আনু" বলে। ভারী মিষ্টি মেয়ে। লম্বা, শালীন, ভদ্র। যখন আমার দেওয়া তাঁতের শাড়ি পরে অনুরাধা রবিবার দুপুরে আসে আমাদের বাড়িতে খেতে, তখন মনেই হয় না যে ও বাঙালী নয়। তবে ওদেরও বিয়ে করা এক্ষুণি হবে না। আনুর বাবা পাঞ্জাবে কাজে গেছিলেন, 'রোপার'-এ বা 'মোগা'তে নয়। এখন ঐ সব অঞ্চলে গেলে নিরপরাধ লোকেও টেররিস্টদের গুলিতে মরে কিন্তু উনি মারা গেলেন সাদামাঠা হার্ট-অ্যাটাকে। আমার, তোমার বা আনুর বাবার মতো সাধারণ মানুষেরা মৃত্যুর সময়টাতেও হঠাৎ খবর হয়ে যে যাবো তেমন কপালও করে আসিনি। আনুর একটি ছোট বোন আছে। সে স্কুলে পড়ে। আনুর মা জাকির হুসেন কলেজে আমাদেরই কলিগ্। উনি ইতিহাসের অধ্যাপিকা। রিটায়ার করার মাত্র এক বছর বাকি।

আনু কাজ করে একটি কমার্শিয়াল ফার্মে। জনপথে অফিস ওদের। ছোট বোনকে মানুষ করে তোলার আগে ও বিয়ে করতে চায় না। আমি অনেক করে বুঝিয়েছিলাম। বিয়েটা বিয়ের সময়ে না করে ফেলতে পারলে পরে অনেকসময়েই আর করা হয়ে ওঠে না। সাহসের বড়ই অভাব হয়। তাছাড়া যৌবনের শুরুতেই বিয়ে না করলে দাম্পত্যের মজাও বোধহয় অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। তুমি ও আমি তো এ জীবনে দম্পতি আর হতে পারলাম না। পারবোও না। কিন্তু শুধু মনের ভালোবাসা নিয়ে এতো বছর আমরা কাটিয়ে দিলাম বলে (প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার ! যাই বলো আর তাই বলো !) যে, আনু-যবনও পারবে তার ভরসা কি ? তাছাড়া সব পুরুষ তো তোমার মতো অন্তর্মুখী নয় ; লেখক নয়। পুরুষদের ভালোবাসা ফড়িং-এর মতো। আজ এখানে ; কাল সেখানে। পুরুষরা অধিকাংশই শরীর-সর্বস্বও। তোমার মতো তো সবাইই নয়। আনুর জন্যে চিন্তা হয়

খুবই। ওদের সম্পর্কটাও শুধুমাত্র প্লেটোনিক পর্যায়ে যাতে থেমে না থাকে (ক্বচিৎ-কদাচিৎ দু একটি চুমুকে শারীরিক সম্পর্ক বলা যায় না) তাই প্রতি রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নানা অছিলাতে আমি বাড়ির বাইরে চলে যাই যাতে ওরা একলা হবার সুযোগ পায়। চা খাওয়ার সময়ের আগে আবার ফিরে আসি। ওরাও জানে যে আমি ফিরে আসবো ঐসময়ে। আন্নুই চায়ের জল চড়িয়ে রাখে। এই গরমে দুপুরে বাইরে যাওয়া যে কী কষ্টকর তা দিল্লীতে থাকলে বুঝতে। অনেকদিন আমাদেরই ভাড়া বাড়ির একতলায় খিংগু সাহেবদের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকি। তাতে তাঁদেরও বিরক্ত করা হয়। রবিবারের দুপুর বলে কথা।

কোনোদিন বাসে চেপে লালকেল্লাতে চলে যাই। কোনো বড় গাছের ছায়ায় বসে থাকি নানাদেশী ট্যুরিস্টদের ভিড় দেখি। সাধ হয় ওদের সঙ্গে, ওদের দেশে চলে যাই। কানাডা, ইউ. এস. এ., জাপান, ইউনাইটেড কিংডম্, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, জাম্বিয়া, তানজানিয়া কত দেশ থেকেই না মানুষে দিল্লী দেখতে আসে। বাচ্চারা চিৎকার করে ছুটোছুটি করে। চার থেকে সাত বছরের ফুলের মতো বাচ্চাদের দেখে কখনও কখনও যে বুকের মধ্যেটা কুরে কুরে যায় না এমনও নয়। আমারও তো অমন একটি শিশু থাকতে পারতো। চার থেকে সাত বছরের মধ্যে যার বয়স। কি যুযুবাবু? পারতো না কি?

কোনোদিন বা কোনো এয়ার-কণ্ডিশানড রেস্তোরাঁতে এক কাপ কোল্ড কফি নিয়ে বসে থাকি। খরচটা অপচয় বলে মনে হয়। পর-ক্ষণেই ওদের কথা ভাবি। তবে যেখানে বাচ্চারা যায়, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সে সব জায়গাতেই বেশি যাই।

তুমি তো মেয়ে হয়ে জন্মাওনি। তুমি বুঝবে না যে মেয়ে হয়েও মা না-হওয়াটা কত কষ্টের।

যখন আর আন্নুর জন্যে বাড়ির বাইরে গরমে সেদ্ধ হয়েও এক-

ধরনের গভীর আনন্দ পাই। এক গভীর আনন্দ। জানো যুযুদা। তুমি বোধহয় ঠিকই বলো। অন্যকে আনন্দিত দেখে মানুষ যতখানি আনন্দিত হতে পারে তেমন আনন্দিত সে নিজের আনন্দে কখনওই হতে পারে না।

তোমার মতো মানসিকতার পুরুষ এবং হয়তো আমার মতো মেয়েও আজকাল বড় কমে আসছে এ কথা জেনে একধরনের গর্ব যে বোধ করি না তাও নয়। কিন্তু ভয়ও করে। তুমি ও আমি যাদের সুখের জন্যে, যাদের মুখ চেয়ে নিজেদের সুখকে কোনোদিন ছুঁতে পর্যন্ত পারলাম না তারা যদি বুড়ো বয়সে আমাদের ফেলে দেয়? আমাদের সম্মানের আসনে না বসিয়ে রাখে? তবে?

তোমার ভয় করে না কখনও?

জন্মদিনের অনেক অনেক অগ্রিম শুভেচ্ছা ও আদর জেনো।

—ইতি তোমারই, যুনী।



॥ দুই ॥



আজকে দিল্লী থেকে সেণ্টাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেসের চেয়ারম্যান আসছেন। সঙ্গে ইস্টার্ন রিজিয়নের মেম্বার এবং মেম্বার ইনভেস্টিগেশন ঃ পুরো দেশের ট্যাক্স রেইডের কর্তা।

কালকে চিফ্ কমিশানার সার্কুলার দিয়েছিলেন যেন অনাথরা সবাই সময়মতো অফিসে আসে। অবশ্য ওরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবরে কিই বা দরকার ওদের। কিন্তু চুল টানলেই মাথাও নড়ে। কখন কোন ইন্‌ফরমেশনের দরকার হয়, কোন্ ফাইলে রিকাণ্ড পড়ে আছে, কোন্ ফাইলে ডিম্যাণ্ড তা আগে থেকে জানা যাবেও বা কি করে ?

চেয়ারম্যান সাহেব আর মেম্বার সাহেবরা পকেট থেকে এক-একটি চিরকুট বের করে চিফ্‌কে বা রেসপিকটিভ কমিশানারকে একবার বলে দিলেই তো কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের অ্যাডমিনিস্টেশান-এর একবারে গোড়াতেই টান পড়বে। আর গোড়া মানেই অনাথরা।

রাজনৈতিক নেতাদের ভাষাতে "গ্রাস-রুট লেভেলের" মানুষ। শিরদাঁড়া বেয়ে যেমন ঘাম নেমে গড়াতে গড়াতে পেছনে গিয়ে মিলিয়ে যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেও ঠিক তেমনিই হয়। ঘামেরই মত চেয়ারম্যান থেকে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বয়ে এসে গড়িয়ে গিয়ে থামে ইনকামট্যাক্স অফিসারদেরই পেছনে।

এখন অবশ্য ডি. সি. অ্যাসেসমেণ্টদের পেছনেও। তবে এখন যাঁরা চিফ্ বা মেম্বার বা চেয়ারম্যান তাঁরাও একদিন এই গ্রাস-রুট লেভেল থেকেই শুরু করেছিলেন তাই তাঁরা নিজেরাও এই হরকৎ-

এর রকমটা বোঝেন ভাগ্যিস। তবে কেউ কেউ আবার কনন্তিনি-য়েণ্টলি ভুলেও যান। সেটা চেয়ারেরই দোষে। চেয়ারের মতো অসুখ আর বড় বেশি নেই।

ক্যানসারের চেয়েও বেশি দুরারোগ্য এই অসুখ। কোনো আমলার পেছনে চেয়ার যদি সেঁটেই থাকে তাহলেই মুশকিল হয় অনাথদের মতো গ্রাস-রুট লেভেলের মানুষদের। তবে এই রোগও সেরে যায় যখন পেছন থেকে চেয়ারটাই সরে যায়। সব লেভেলেই যতদিন চেয়ারে আছেন ততদিন চেয়ার যে একদিন-না-একদিন সরবেই এই কথাটি কিছু কিছু আমলা বেমালুমই ভুলে যান। চেয়ার ছাড়ার পরে তাঁদের যা অবস্থা হয় তা আর কহতব্য নয়। সে অনাথদের চেয়ারই হোক ; কী উপর মহলের চেয়ারই হোক।

এসেছিলেন সকলেই। অনাথ, রায়, রথীন, সুপ্রভাত, বিজয়, অনিমেষ, অনিরুদ্ধ সবাই মিলে অনাথের ঘরে চা খাচ্ছিলেন। সবাই অফিসার। প্রত্যেকের অফিসেই বলা ছিলো কমিশানারের ফোন এলে যেন সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, সাহেব টয়লেটে গেছেন।

রায় বললেন, কাল তাহলে সোম বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা হলো ?

অনাথ বললেন, হ্যাঁ। তা না হলে আর বলছি কী !

তোর নামটা কিন্তু বাঁড়ুজ্যে সাহেব ভালই দিয়েছিলেন। ক্যালকুলেটর !

সুপ্রভাত বললেন, এখন আর ক্যালকুলেশানের আছেটা কি ?

ওঁর এক বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হলো, মিনিতে যাচ্ছিলেন আমার সঙ্গে। কী অদ্ভুত নাম রে ভদ্রলোকের, যুযুধান। মানেই জানিনা।

অনাথ বললেন, যুযুধান মানে জানিস না ? এ কোন্ যুযুধান রে ? লেখক যুযুধান রায় নয় তো ?

অনাথ বললেন, না না। উনি ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্টে কাজ করেন।

আরে! সে তো কবি যুযুধান রায়ও করেন।

রথীন বললেন।

তাই?

না তো কি?

তা না হয় খোঁজ করা যাবে কিন্তু নামের মানেটা কি?

রথীন বাংলা সাহিত্যের খুব ভক্ত। বিজয়কে বললেন, মানে বলিস না বিজয়। অনাথ একটি বাংলা অভিধান কিনে নিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখবে। মানেটা কি?

অভিধান কিনে কি হবে? বাড়ি গিয়ে ছেলেকে জিগেস করলেই জানতে পারবে।

সুপ্রভাত বললেন, ছেলে তো সাহিত্য-অনুরাগী একজন।

ভালোই বলেছিস! ছেলে তো ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়ে। বাংলার পণ্ডিতই বটে। নিজের বাবার নামের মানেই জানে না তায় আবার যুযুধানের মানে! পারলে আমার বউই পারবে।

অনাথ বললেন।

তা বটে। বউরাই তো বাংলা সাহিত্য আর বাঙালী সাহিত্যিকদের বাঁচিয়ে রেখেছে, যাই বলিস আর তাই বলিস। আমাদের এ সব পড়ার সময়ই বা কোথায়? ম্যানুয়াল পড়বো, না বোর্ডের আর কমিশানারের সার্কুলার পড়বো, না ঐ সব। তাছাড়া আইনও তো রোজই পাল্টাচ্ছে। মাথামুণ্ডু বোঝার আগেই লেজ পালটে যাচ্ছে।

বর্ষার আকাশের মতো। যা বলেছিস।

রায় বললেন।

এবারে সময় হবে সকলেরই। অগাস্ট মাসের মধ্যেই যদি নাইনটিন এইট্টিএইট-এইট্টিনাইনের সব অ্যাসেসমেন্টস শেষ করে দিতে হয়,

তাহলে তার পরে তো একেবারে যাকে বলে অখণ্ড অবসর। তখন আমরাও বাংলা সাহিত্যের প্রাণ-সঞ্চারক হবো।

হাসতে হাসতে অনিমেষ বললেন।

শুধু আমরাই নয়, অ্যাডভোকেট আর অ্যাকাউন্ট্যান্টসরাও হবেন। তাঁদেরও তো রিটার্ন-ফাইলিং আর স্ক্রুটিনী-কেস ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

না। কিছু আপীল ট্রাইব্যুনাল তো থাকবে।

তাও বা সংখ্যাতে কত? আর সকলেই তো ট্রাইব্যুনালে যান না।

তা যা বলেছিস। অনিমেষ বললেন।

এমন সময় অনাথের ঘরের ফোনটা বাজলো। অনাথ বললেন, একটু চুপ কর, চুপ কর। কমিশানাররাও তো টেন্স হয়ে আছেন সবাই আজ। কার কখন ডাক পড়ে চিফ্-এর বা মেম্বারের বা চেয়ার-ম্যানের ঘরে। আমার কমিশানারের ফোন হলে গালাগালি খেতে হবে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলবেন: আপনার ঘরে কিসের কনফারেন্স চলছে এখন ঘোষ?

রায় বললেন, বলবি, আপনার কনডোলেন্স্ মিটিং হচ্ছে স্যার।

এই কী হচ্ছে। চুপ কর। চুপ কর।

সবাই চুপ করে গেলে অনাথ ফোনটা তুললেন।

হ্যালো!

ঘরের সকলেই চা খেতে খেতে অনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ও-ও। আপনি? যুযুধান বাবু? স্বস্তির গলায় অনাথ বললেন, বলুন! বলুন! অনেক দিন বাঁচবেন। একটু আগেই আপনার কথা হচ্ছিল। তা, আমার নাম্বার কোথায় পেলেন?

ও আচ্ছা। আচ্ছা। বেশ করেছেন। আপনার অফিস কোথায়? রাইটার্স বিল্ডিংএ? ও তাহলে তো কাছেই। ও। না। ব্যানার্জী

সাহেবের ঠিকানাটা তো আমার কাছে নেই। তবে উনি আসেন মাঝে মাঝে। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তা পারবো না কেন ? বলুন, আপনার ঠিকানা। লিখে নিচ্ছি। হ্যাঁ। ফোন নাম্বারও দিন ! উনি যখন আসবেন তখন যাতে পান তার বন্দোবস্ত করব। না, না। আমি বেশ কয়েক কপি টাইপ করিয়ে যাঁদের কাছে উনি আসেন তাঁদের প্রত্যেকর কাছেই এক কপি করে দিয়ে রাখবো 'খন যাতে উনি অবশ্যই পান। কোনো চিন্তা নেই আপনার। আমি মুখেও বলব আপনার কথা দেখা হলে। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ও। এখন আপনার বাড়ির ফোনটা খারাপ। বলে দেবো। বলে দেবো। নিশ্চয়ই বলে দেবো। হ্যাঁ আসবেন একবার। না, না। কাজ তো আছেই, থাকবেই।

রথীন বললেন, কবি কি না জিগেস করবি তো ?

ও। হ্যাঁ। আচ্ছা যুযুধানবাবু, আপনি কি লেখক ? অ্যাঁ ? তাই বলুন। আমার বন্ধুরা··

রথীন টিপ্পনী কাটলেন, অনাথ তুই সত্যিই একটা পাঁঠা। তাড়াতাড়ি একদিন আসতে বল ভদ্রলোককে। আলাপ হবে।

তা একদিন চলে আসুন তাড়াতাড়ি। আমার বন্ধুরা আলাপ করতে চান।

আচ্ছা। আচ্ছা। আসবেন তাহলে।

উনিই লেখক যুযুধান রায় ?

ইয়েস স্যার। এবারে একদিন আলাপ করিয়ে দেবো।

তোর কাছে ইঁটও যা যুযুধান রায়ও তাই। সুপ্রভাত বললেন।

তারপর কিছুক্ষণ যুযুধানকে নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা হলো। কে কি বই পড়েছেন তা নিয়েও। আলোচনা শেষ হলে অনিরুদ্ধ বললেন, ভেবো না, অ্যাসেসমেণ্ট থাকবে না বলে অন্য কাজও থাকবে না। রোজই রেইড্ করতে যেতে হবে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে। এতোদিনে ডিপার্টমেণ্টের টনক নড়েছে। জেনে গেছে যে,

কাঁচা-টাকা, সোনা এসব কলকাতার চেয়ে মফঃস্বলের শহরে এবং গ্রামেই অনেক বেশি আছে। মধু যখন একবার পাওয়া গেছে তখন লাগাতার রেইড হবে। এতোদিন, যে কেন এটা ডিপার্টমেন্টের মাথায় খোলেনি, তা কে জানে।

অনাথ বেল টিপে, তদারকীর লোককে ডেকে, কাগজটা দিয়ে অফিসে নিয়ে গিয়ে যুযুধান রায়ের অফিস ও বাড়ির ঠিকানা, ফোন নাম্বার সব দশ কপি করে টাইপ করাতে বললেন। অনিমেষকে বললেন, তোকেও এক কপি দেবো অনিমেষ। তোর কাছেও তো আসেন সোম বাঁড়ুজ্যে সাহেব।

দিস্। তবে কবে যে আসবেন তা উনিই জানেন।

সুপ্রভাত আর রথীন বললেন, বাঁড়ুজ্যে সাহেব আসার আগেই আমরা নিজেরাই যুযুধান রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

ফোনটা আবারও বাজলো।

হ্যালো। অনাথ চায়ের কাপটার তলানিটুকু গিলে বললেন।

ইয়েস্ স্যার। যাচ্ছি স্যার। এখুনি যাচ্ছি। হ্যাঁ ফাইলটা নিয়েই যাচ্ছি।

টেলিফোন নামাতেই সকলেই সমস্বরে বললেন, কে ? কে রে ?

আর কে ? চিফ-কমিশানার স্বয়ং। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। চেয়ারম্যান ফাইল চেয়েছেন। উকিল অবশ্য বলেই গেছিলেন যে চেয়ারম্যান অবধি তাঁর জানাশোনা আছে।

কে উকিল ?

আরে হ্যালাখ্যাপার মতো দেখতে একটা লোক। আগে কোনোদিন অ্যাপিয়ারই করেনি। তোরাও চিনিস না।

ফাইলটা কার ?

একজন নেতার ছেলের।

উকিলের নাম কি বল্ল না? বাঙালী?

বড় কেস আর বাঙালী উকিলদের কাছে কোথায়? নাম পরে বলব 'খন। প্রাণটা বাঁচিয়ে ফিরে তো আসি আগে।

ছাড় তো! উল্টে তোর আরও ভালো হলো। যা গোলমাল আছে, তা সব দেখিয়ে দিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে ইনস্ট্রাকশানস্ চাইবি। তারপর বেঁধে যোগ করবি। কাজই যদি না জানে তো শুধু জানাশোনা দিয়ে কি হবে? ঘোড়ার ডিম! সত্যিকারের ভালো উকিল, তাঁর যতই জানাশোনা থাক, কখনও কমপ্লেইন্ করবেন না। নিজের গুণে 'উইনওভার' করবেন। এ উকিল যে হ্যালাখ্যাপা তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

অনাথ লোহার আলমারি খুলে ফাইলটা বের করেই আলমারিটা শব্দ করে বন্ধ করলেন। তারপর ফাইল হাতে দরজার দিকে এগোলেন।

ওঁরা সকলেই উঠে পড়লেন।

অনিমেষ বললেন, ফিরে এসেই ফোন করিস আমাকে একটা। কী হলো তা জানতে ইচ্ছে করবে।

আমাদেরও।

সেই উকিলকে একটু চিনিয়ে দিস তো।

রায় বললেন।

দেবো।

অনাথ বললেন।

হ্যালাখ্যাপাকে একটু টাইট দিতে হবে সকলে মিলে।

॥ তিন ॥

রাত প্রায় এগারোটা হলো। যুনীকে চিঠিটা লেখা শেষ করে একটা হাই তুললো যুযুধান। হাইটা, চিঠি লেখার ক্লান্তিজনিত নয়। অন্য অবসাদ জনিত।



কলমটা যুনী পাঠিয়েছে আজ প্রায় দিন পনেরো কুড়ি হয়ে গেলো। গত সাতদিন হলো পোস্টাফিসে রোজই খোঁজ করে করে হয়রান হয়ে গেছে ও। ওঁরা বললেন জি. পি. ওতে খোঁজ করুন। আজ তাই গেছিলো অফিস যাওয়ার পথে। সেখানেও কোনো হদিস মিললো না।

বড়ই অসহায় অবস্থা। চুরি না করেও এমন চোর হয়ে থাকা প্রতিমুহূর্ত, এ আর ভালো লাগে না। কিছু একটা করা দরকার। কিছু একটা ঘটা দরকার। কোনো বিস্ফোরণ। এই তো গেলো পোস্টাফিসের কথা। এদিকে বাড়ির ফোনটাও আজ প্রায় দুমাস হলো খারাপ হয়ে আছে। মাঝে দুদিনের জন্যে ঠিক হয়েছিলো। জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করেছিলো একটা। ভেবেছিলো, সামান্য হলেও ওর লেখক পরিচয়টা ভাঙিয়ে যদি এই দয়াটুকু পাওয়া যায়। উঁচু-মহলের আমলারা তো সাধারণত সংস্কৃতিসম্পন্ন হন।

যুযুধানের প্রত্যেক জন্মদিনেই যুনী দিল্লী থেকে একটা ফোন করেই সকালবেলাতে। কিন্তু ফোনটা এখনও ঠিক হলো না। যতই যুযুধানের জন্মদিনটা এগিয়ে আসছে, ততই উত্তেজনা বাড়তে থাকছে।

অথচ পার্সেল বাড়িতে বা পোস্ট অফিসে পৌঁছনো বা ফোন সারানোটা পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট আর টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টেরই

দায়িত্ব। কর্তব্য। এতে কোনো দয়ার ব্যাপারই নেই। অন্য দেশ হলে এতোদিনে ক্ষমা চেয়ে চিঠি আসার কথা ছিলো। প্রতিযোগিতা থাকলে এমনটি হবার উপায়ই ছিলো না আদৌ। তবু অনেক দ্বিধার পরই নিজেকে ছোট করেছিলো যুনীর কথা ভেবেই।

অফিসের অপারেটরের কাছ থেকে নাম জেনেছিল নতুন জেনারেল ম্যানেজারের। আগের জি. এম. তাঁকে চিনতেন। এঁর নাম শ্রীহীরালাল মুখার্জী। তাঁর নাম্বার ডায়াল করাতে একজন মহিলা ফোন ধরলেন। হয়তো ওঁর পি. এ.-ই হবেন। তা হওয়াই স্বাভাবিক। বললেন, জি. এম. তো মীটিঙে ব্যস্ত আছেন। বলুন আপনি কি বলবেন?

অত্যন্ত ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ স্বর মহিলার। তবে বেশ ব্যক্তিত্বময়।

যুযুধান বললো, নিরুপায় হয়েই জি. এম.কে কষ্ট দিচ্ছি। আপনাকেও।

মহিলা তেমনিই ঠাণ্ডা গলায় বললেন, না কষ্টর কি? বলুন। আপনার ফোন নাম্বার বলুন, মানে, যে নাম্বার খারাপ।

ফোন নাম্বার দিয়ে যুযুধান বলে দিলো, দয়া করে যদি এই উপকারটা করেন বড় কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ফিউচারে যদি আবারও বিরক্ত করার দরকার হয়।

আমার নাম? বলে একটু চুপ করে থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, ইলা বোস।

যুযুধান বললো, অনেক ধন্যবাদ।

ভাবলো ফোনটা যদি আরও তিন চার দিনের মধ্যে ঠিক না হয় তবে জি. এম. শ্রীহীরালাল মুখার্জীর পি. এ. ইলা বোসকে আবারও ফোন করবে ও। এখানে ক্ষমা চাওয়া তো চিন্তারও বাইরে। এঁরা দয়া করেই কারো কারো ফোন ঠিক করে দেন।

চিঠিটা লেখা শেষ হয়েছিল অনেকক্ষণই। খামে বন্ধ করার আগে একবার পড়ে দেখলো যুযুধান।

কলমটা যে পায়নি সে কথা জানিয়ে দুঃখ দেয়নি ও যুনীকে।

কলকাতা

যুনী কল্যাণীয়াসু,

তুমি এমন চিঠি লেখো যে মন ভারী খারাপ হয়ে যায়। তোমার চিঠি পেয়েছি প্রায় দশ দিন হলো। ভেবেছিলাম, যে তোমার কলমটি হাতে পেয়ে তোমার কলম দিয়েই এই চিঠিটা লিখব। তাই এতো-খানি দেরি হলো।

চমৎকার কলম। এতো দামী কলম কেন পাঠালে? ভালো ও দামী কলম ব্যবহারের যোগ্যতা কি সকলের থাকে? আমার কাছে তুমি এমনিতেই এতো দামী যে আমাকে দেয় তোমার আর কিছুমাত্রই নেই। তোমাকেও আমার অদেয় কিছুই যে নেই সে কথা তুমিও জানো। অবশ্য এই দেয়া আর কলম দেয়া সমার্থক নয়। শুধু কবে এবং কখন যে শেষ দেয়া-নেয়া সম্পূর্ণ হবে সেই অপেক্ষাতেই আমাদের দুজনেরই দিন গোনা। কিন্তু এই দেয়া-নেয়ার স্বপ্ন কোনোদিনও কি সত্য হবে? আজকাল কেবলি মনে হয় যে, বেলা পড়ে আসছে; সময় আর বেশি নেই।

চমৎকার লিখছে তোমার কলম তরতর করে। যেমন সুন্দর রঙ তেমনি সুন্দর নিব। কিন্তু এমন কলম যদি প্রথম যৌবনে পেতাম তবে তার দাম উসুল করে নিতাম। এখন তরতর করে লেখার মতোই যে কিছু নেই। বৃষ্টির পরে বিকেল বেলার আলো যখন পড়ে আসে, ধোয়া-মোছা চিকন ডানা মেলে যখন ক্বচিৎ পাখি ডেকে ওঠে, ফড়িং ওড়ে ঝাঁক বেঁধে, আর মন ভারী খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, বেলা হলো। এবারে যেতে হবে।

যাই হোক, কলমের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে ছোট করব না।

হবে। তার উপর আমি যতদিনে রিটায়ার করবো ততদিনে রাজ্য-সরকারও পেনসান্-এর বন্দোবস্ত করে ফেলবেন মনে হয়। রিটায়ার করতে তো অনেকই দেখি। তোমারও তো যতটুকুই হোক পুঁজি কিছু থাকবেই। দুজনের সঞ্চয় এবং আয় মিলিয়ে কি চলে যেতো না আমাদের? তুমি কাছে থাকলে আমি পেটে না-খেয়েও থাকতে পারতাম। পেটের খিদে ছাড়াও তো মানুষের অন্য রকম খিদে থাকে। সময়ে খিদে না মিটোতে পারলে শেষবেলায় পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দিলেও তখন আর খাওয়া যায় না। খিদে মরে যায়। অম্বলের ব্যথা ওঠে। এতো বোঝো, আর এটুকু বোঝো না তুমি?

আমার এক সহকর্মী প্রণবেশ বলছিলো শান্তিনিকেতনে এই বেলা সস্তায় কিছু জমি কিনে রাখতে। যাতায়াতের এখন খুবই সুবিধে। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া এখন বেড়ে বেড়েই চব্বিশ টাকা হয়েছে। আগে আরও কম ছিলো। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গায়ক অর্ঘ্য সেন, নাট্যজগতের কুমার রায়, টপ্পাগায়ক চণ্ডীদাস মাল মশায় এবং আরো অগণ্য নামী ও অনামী মানুষ জমি কিনে বাড়ি করেছেন এবং করছেন ওখানে। ওখানের সব নামী দামীরা তো আছেনই! অবশ্য এখন আর ভালো' জায়গাতে জমি কেনার সামর্থ্য আর আমাদের হবে না। 'প্রান্তিক' স্টেশানের কাছাকাছি যদি দু'তিন কাঠা জমিও সস্তাতে পেতাম তাহলে নিয়ে রাখতাম। পরে, ছোট্ট একটা বাড়ি করে নিতাম। নিজে হাতে বাগান করতে তুমি। আমি বসে বসে ফুলের শোভা দেখতাম। আর তোমার শোভা। ওদিকে দাম নাকি এখনও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আছে।

আমার মতো প্রচণ্ড নিষ্কর্মা লোকের পরকর্মজনিত আনন্দ যে ঠিক কী প্রকার তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দিল্লী থেকে আসার সময় তুমি বেশ তোমার গাড়োয়ালি খিদ্‌মদ্‌গার কেশর সিংকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। শান্তিনিকেতনের জব্বর শীতে যখন অগণ্য মানুষ পৌষ-

মেলা বা মাঘোৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে আনন্দর খোঁজে ছুটতো তখন আমি শুধু আরামে তোমার নিয়ে-আসা হিমাচল-প্রদেশের কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতাম। তুমি নিজে হাতে চা করে আনতে আমার জন্যে। আঃ। ভাবতেই কী যে ভালো লাগে কী বলব।

একেকজনের আনন্দর রকমটা একেকরকম। কুঁড়েমি করে অথবা কিছুমাত্রই না করে আমি যে কি গভীর আনন্দ পাই তা তোমাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না। তাছাড়া দৌড়োদৌড়ি করে আনন্দ করার বয়স এখন আর নেই। এখন ইজিচেয়ারে শুয়ে ভাবতে কী কোনো ভালো বই পড়তে যা আনন্দ পাই কাশ্মীর কন্যাকুমারী দেখে তা পাবো বলে মনে হয় না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর একটি বই আছে না? পড়েছো কি সে বই? "In Praise of Idleness". মহৎ মানুষ তিনি। তাই কুঁড়েমির মূল্য বুঝেছিলেন।

এ চিঠি পেয়েই আমাকে লিখো। তোমার সাড়া পাওয়া মাত্রই প্রণবেশের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এক শনিবার চলে যাবো জমি দেখতে। বাড়ি হোক কী নাই হোক, আমাদের মতো মধ্য এবং নিম্ন-বিত্ত মানুষদের বাড়ির জন্যে জমি দেখার মধ্যেও যে কী প্রকার এক-ধরনের বড়লোকী-ভাব সুপ্ত থাকে তা তুমি কি অনুমান করতে পারো?

শান্তিনিকেতনে শেষ গেছিলাম কলেজে পড়ার সময়ে। একবারই গেছিলাম। তাও, যাহা শেষ তাহাই প্রথম। গেছিলাম বসন্তোৎসবে। কলেজের চার বন্ধু মিলে গেছিলাম। একজন বন্ধুর অধ্যাপক কাকার বাড়ি দুপুরের খাওয়া, অন্যর লেখিকা দিদার বাড়ি রাতের খাওয়া এবং অন্যতর বন্ধুর আর্টিস্ট ব্যাচেলার মামার বাড়ি, নিচুবাংলার কোয়ার্টারের মেঝেতে শুয়ে রাতটা কাটানো হয়েছিল। শাল ফুলের গন্ধ, পূর্ণিমার

চাঁদ, আর আমাদের কচি চোখে নৃত্য-গীতরতা আমবাগানে আর শালবীথিতে ঘুরে বেড়ানো কচি-মেয়েদের মুখের ছায়া বুকে করে বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে পরদিনই ফিরে এসেছিলাম অসহ্য ট্রেনে চেপে। সেই শান্তিনিকেতনেই সেই যুযুধান রায়ই যে তার নিজের এবং নিজস্ব হবু-স্ত্রী যুনীর জন্য বাড়ি করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে জমি দেখতে যাবে এই ভাবনাতেই যুযুধানের চিত্ত বড় অস্থির হয়ে রয়েছে। কী যে উত্তেজনা! তা বুঝিয়ে বলতেও পারবো না।

যুনী, তুমি কি একবার শান্তিনিকেতনে জমি দেখার জন্যও আসতে পারো না? রাজধানী এক্সপ্রেসে এসে রাজধানী এক্সপ্রেসেই না হয় ফিরে যাবে? সব খরচা আমার। এতোটুকু করার ন্যূনতম স্পর্ধাও তো আমার থাকা উচিত তোমার ভাবী জীবনসাথী হিসাবে।

না, কি?

ভালো থেকো। আমার জন্মদিনে অনেক আদর ও ভালোবাসা জেনো।

ইতি তোমার যুযুদা



॥ চার ॥



যুযুধান রবিবারের সকালে রসিয়ে রসিয়ে দু কাপ চা খায়। দুটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে। শ্রীলা মেয়েটি বড় ভালো। সে যে যূনীর আত্মীয়া বলেই যুযুধানকে এক বিশেষ চোখে দেখে তা নয়, যুযুধানের ছোট ভাই অমলের উপরে ও যেন ঠিক নির্ভর করতে পারে না।

খোকা আসার পর শ্রীলার দায়িত্ব, চিন্তা, ভাবনা ঠিক যে হারে বেড়েছে, অমলের দায়িত্ব-কর্তব্যও যেন ঠিক সেই হারেই কমেছে। এই অসহায়তার মধ্যে যুযুধান বুঝতে পারে যে শ্রীলা ক্রমশঃই যুযুধানের উপরে বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছে। এ কথাটা বুঝতে পেরে যুযুধান যেমন খুশি হয়, তেমন অখুশিও হয়।

অমল পড়াশোনাতে কোনোদিনও ভালো ছিল না। টুকে-টাকে পাশ করেছে চিরদিনই। তারপর বি. কম্‌টা যে কি করে পাশ করলো তা সেই জানে। চাকরি একটা যুযুধানই গলবস্ত্র হয়ে অনেককে অনুরোধ করে জুটিয়ে দিয়েছিলো। এক বাঙালী ব্যবসাদারের ফার্মে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের। হলে কী হয়, অর্ধেক দিনই অফিসে যায় না। নিজের খাটনির হিসেব না রাখলেও মালিকের আয়ের হিসেবটা ঠিকই রাখে এবং সবসময়ই বলে, ও শালা আমাকে যা মাইনে দেয় তার চেয়ে বেশি কাজ করে দিই।

কিন্তু যে মাইনে ও পায় সেই মাইনেতেই যে ওর চেয়ে অনেক ভালো এবং খাটিয়ে ছেলে চাকরিটা পেলে বর্তে যায় চাকরিটা পাবার পর সে কথাটাই আর একবারও মনে রাখে না। ফাঁকি মারা, দেরিতে

অফিস যাওয়া এবং কামাই করাটাকেই চালাকির পরাকাষ্ঠা বলে মনে করে।

এই করেই চোখের সামনে একটা পুরো জাত নষ্ট হয়ে গেলো। অনেকই কারণ হয়তো আছে তার পেছনে। সবচেয়ে বড় কারণ এই শ্রমবিমুখতা, ওপর-চালাকি।

যুযুধান নিজের ভাইয়ের ব্যাপারেই কিছু বলার অধিকার রাখে না, জাত-টাত তো অনেকেই বড় ব্যাপার। একটা জিনিস লক্ষ্য করে এই দুঃখের মধ্যেও আনন্দিত হয় ও। সে কথাটা হলো, বাঙালী ছেলেরা যে-হারে ফাঁকিবাজ, অলস, নেশাগ্রস্ত, মদ্যপ, পরশ্রীকাতর হয়ে উঠছে, বাঙালী মেয়েরা যেন ঠিক সেই হারেই পরিশ্রমী, দায়িত্ববতী, কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্না হয়ে উঠছে। যে-কোনো জাতের যখন পতন ঘটে তখন এই সমস্ত লক্ষণ সব জাতের মধ্যেই পরিস্ফুট হয় বোধহয়। বাঙালী পুরুষ হিসেবে এ কারণে বড় লজ্জাবোধ করে যুযুধান।

ইদানীং অমল কিছু ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করছে যাদের যুযুধান ভালো বলে মানতে পারে না। তারা যে ঠিক কি করে জীবিকা হিসেবে, যুযুধানের আদৌ জানা নেই। তবে, তারা প্রায়ই ফ্যান্সী-মার্কেটে যায়। খিদিরপুরের মুসলমান স্মাগলারদের কাছে যায়। হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা। শ্রীলার জন্যে বিদেশী সাবান, পারফ্যুম, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি, জর্জেট শাড়ি এসব নিয়ে আসে। ও নাকি একটি মোটর সাইকেলও বুক করেছে। কোত্থেকে টাকা পায় তা অমলই জানে।

বাড়িতে ও সব-সুদ্ধু তিনশো টাকা দেয়। বাকি সব খরচ যুযুধানের। অথচ অমলরাই তিনজন লোক। যুযুধান তো একা।

কিছুই বলে না যুযুধান। ভাবে, একটাই তো ভাই! তাছাড়া নিজের বিয়ে কখনও হবেই যে, এমন স্থিরতাও নেই। ছোট ভাই আর তার পরিবারকেই তাই আপন করে নিয়েছে।

খোকাটা 'জেতু' 'জেতু' করে টালমাটাল পায়ে ওর কাছে যখন

আসে তখন ওর মুখের দুধের গন্ধ, স্বর্গীয় হাসি, যুযুধানের মনের কোণের সব বিরক্তিই উড়িয়ে দেয়। সব শিশুরাই স্বর্গের বাগানের শিশু। এ পৃথিবীর কোনো মালিন্য কোনো কুটিলতা বা চক্রান্তর মধ্যেই ওরা নেই। কিছুক্ষণ ওদের কাছে থাকলে নিজের মনই পবিত্র হয়ে যায়। ওরা সব দৈবী-রাজা।

এখন সকাল আটটা বাজে। শ্রীলা এসে বললো, খোকা! জেতুকে বিরক্ত কোরো না। তারপর বললো, দাদা আজ রামের সুমতি হয়েছে। আপনার ভাই বলেছে, বাজারে যাবে। আপনি কি ভাল মাছ খাবেন জিগেস করে পাঠালো। ইলিশ? না বড় কই? না চেতলের পেটি?

মাছ? ভালো? অবাক হয়ে যুযুধান বললো, আজকাল ভালো মাছের দাম তো আশি টাকা কেজি।

ও তা জানে। তবু বলেছে দাদা কি মাছ খাবে জিগেস করে এসো। একদিন খাওয়াবে।

মাছটাছ আনতে হবে না। বলো কাৎলা মাছের মাথা নিয়ে আসুক। মুড়িঘণ্ট করো। মাছও হবে, সস্তাও হবে।

ও কিন্তু মাছের দামের কথা জানে। একদিন শখ করে বলেছে, না করবেন না দাদা। মনে দুঃখ পাবে।

ঠিক আছে। চেতল মাছ আনতে বলো। তেলওয়ালা-পেটি। কত্তবছর যে খাই না। আজ মাসের পঁচিশ তারিখ। চাকুরেদের বাড়িতে হঠাৎ কিসের মোচ্ছব লাগলো? ওকি কোনো বোনাস-টোনাস পেয়েছে? অসময়ে?

তা আমি জানি না দাদা। শ্রীলা বললো, সে সব আপনি ওকেই জিগেস করবেন।

খবরের কাগজের পাতায় মনোনিবেশ করলো যুযু, শ্রীলা চলে গেলো।

শ্রীলা মলিন মুখে চলে গেলো। ভাবলো দাদার মন ভারী ছোট। ছোটভাই আদর করে মাছ খাওয়াবে বললো তাতে এতো জেরা কিসের? অবশ্য মাসের শেষের রবিবারে হঠাৎ কিসের মোচ্ছব, কোন্ কামাইএর জোরে? এ কথা যে শ্রীলারও একবার মনে হয়নি তা নয়। তবে শ্রীলাও অন্য যে-কোনো গড়পড়তা মেয়েরই মতো। টাকা পেলেই ওরা খুশি। সে-টাকা কোত্থেকে এলো তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই।

যুযুধানের কলিগ শুভব্রতর যে কারণে চাকরিটাই গেলো। ভালো ছেলে ছিলো চিরদিনই। অভাব বলতেও তেমন কিছু ছিলো না কিন্তু প্রতিবেশীদের যা আছে সবই আমার চাই এই মনোভাবের কারণেই ওর অবুঝ অশিক্ষিত বৌএর জন্যেই শেষে চাকরিটাই চলে গেলো বেচারীর।

পিয়ারলেসের এজেন্ট হয়েছে এখন। মাঝে মাঝে আসে অফিসে। কিন্তু যারা ট্যাক্স দেয় তাদের পিয়ারলেসের পলিসি নিয়ে তো লাভ নেই। কোনো ছাড়ই পাওয়া যায় না। তাই যুযুধান শুভব্রতকে সাহায্য বিশেষ করতে পারে না।

ভারী ভয় করে যুযুধানের অমলের জন্যে। জীবনের যে-সময়ে নিজের দিকে তাকাতে বড় ইচ্ছে করছে, যূনীকে ঘিরে যখন অনেকই কল্পনা, তখনই ওর মন অমলের কারণে বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। নানারকম অশুভ এবং ভয়ের ভাবনাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও জড়িয়ে ফেলছে নিজেকে। ভাইয়ের কর্মের উপরে ওর তো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু কর্মফলের বোঝা তাকে বিলক্ষণই বইতে হবে যে, সে কথা ও জানে।

মনে মনে বললো, একদিন অমলের সঙ্গে বসতে হবে। কিন্তু তার তো চেহারাই দেখতে পায় না। কবে বসবে? কখন?

এমন সময় কে যেন খুব জোরে জোরে কড়া নাড়লো। এই গলিতে

মাত্র একটি বাড়ি ছাড়া কোনো বাড়িতেই কলিং বেল নেই। দেওয়ালের পুরোনো ঘড়িটা সময় দেখাচ্ছিলো সাড়ে আটটা। রবিবারের এই সময়টুকুতে তাকে কেউ বিরক্ত করুক এটা চায় না যুযুধান। কিন্তু কে আসতে পারে এই অসময়ে?

নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে বিরক্ত মুখে দরজা খুললো।

কী রে! তুই?

এলাম। তুই এতোজনকে পেয়াদা লাগিয়েছিলি যে না এসে কী করি। পরশু ইনকামট্যাক্সে যেতেই প্রায় পাঁচজন তোর ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলো। সরি যুযু। ফোনে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসা সম্ভব হলো না। তাছাড়া আমার নিজের তো ফোন নেইও।

ফোনের কথা আর বলিস না। গত ছমাস ধরেই খারাপ। মাঝে একদিনের জন্যে ভালো হয়েছিলো। জাস্ট "ক্যাডনট্ কেয়ারলেস্" অ্যাটিচ্যুড। আমাদের আত্মসম্মান, লজ্জা, এসব ব্যাপার সত্যিই লোপ পেয়ে গেছে। জেনারাল ম্যানেজারকে ফোন করে কখনও ফাঁকা পাওয়া যায় না। মীটিং-এ থাকেন নয়তো কনফারেন্সে। হতেই পারে। সব অর্গানাইজেশানের বড় সাহেবরাই মীটিং আর কনফারেন্সেই থাকেন। কিন্তু তাঁর পি.এ. ও যে মিথ্যা নাম বলে আমার মতো নির্বিরোধী লোককেও অপমান এবং বিভ্রান্ত করতে পারেন এটাও অভাবনীয়। এই রকম অভদ্র ও অন্যায্য রসিকতা সত্যিই অভাবনীয়।

তুই একটা ইডিয়টই আছিস মাইরী। ফোন খারাপ তো জেনারাল ম্যানেজার কী করবে? তাঁরা বড় আমলা। মীটিং, কনফারেন্স নিয়েই তো থাকেন। পরের প্রোমোশান। ওদের কত কি করার আছে। তুই তোর পাড়ার টেলিফোনের অফিসে লোক ঠিক করিসনি?

সেটা আবার কি?

যাঃ বাবা! রামরাজত্বে বাস করিস তা বেঁচে থাকার ঘোঁৎঘাঁৎটুকুও শিখিসনি? তাদের যদি মাঝে মধ্যে কিছু না দিস তাহলে তোর

ভালো টেলিফোনও খারাপ করে দিয়ে যাবে এসে। সব একসচেঞ্জেই এই ব্যাপার। মাইনেটা তো উপরি। এই সবই তো আসল রোজগার। কালকাতায় অগণ্য ব্যবসাদার আছেন, যাঁরা এখন কলকাতার মালিক। তাঁরা ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই দিনে রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছেন। মাস শেষে কিড়িঙ-কিড়িঙের লোক এসে মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের বিল চাপছে তোর আমার ঘাড়ে। ফাস্‌কেলাস্ চলছে মাইরী দেশটা।

যুযু বললো, আমার এক কলিগ গ্রামাঞ্চলে এক ছোট্ট নতুন বাড়ি করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের আণ্ডারে সে জায়গা। প্রথম প্রথম বিল আসতো মাসে পনেরো কুড়ি টাকা। তিন মাসের বিল আগাম। এবারে এসেছে প্রতি মাসে চারশো টাকা করে। তাও আগাম তিন মাসের। অথচ বাড়িতে মালী ছাড়া কেউই থাকে না। মিটার নাকি বাড়ি তৈরী হওয়ার পর থেকে একদিনও কেউ পড়তেই আসেনি গত দেড় বছরে সে কি করে হয়?

হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে খবর নিয়ে দেখবি যে ওঁরা তিন মাসের আগাম বিলই পাঠান। ওঁরা গন্ধ শুঁকেই বলতে পারেন কার কতো বিল হতে পারে। বিশেষ করে ফাঁকা বাড়িতে। যে ম্যান-পাওয়ার মিটার-রিডিং করে নষ্ট হবে সেই ম্যান-পাওয়ার অন্য কনস্ট্রাকটিভ কাজে লাগানো হচ্ছে। স্টেট গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের তো অসহ্য কাজের চাপ।

বলেই, সোম বললো, সরি। তুইও তো স্টেট গভর্নমেন্টের।

তাতে কিছু নয়। এ কথা আমি অস্বীকার করবো না যে আমাদের বড় বড় আমলা থেকে কেরানীরাও, কাজ অধিকাংশ মানুষই করেন না। কাজ করাটা পশ্চিমবঙ্গে এখন 'ফ্যাশানেবল্' নয়। তাইতো রাজ্যের এমন অগ্রগতি।

সোম বললো, তাই তো বলি, হয় চুপচাপ সব সহ্য করে যা নয়

প্র্যাকটিকাল হ। অন্য দশজন যা করে, তাই কর। তালে তাল দে। "মহৎ বুদ্ধিজীবী" বলে সব রকম নীচতার বেসাতি কর।

প্রণব বলছিলো, যুযুধান বললো।

প্রণবটা কে? সোম বললো।

আরে আমার কলিগ, যার গ্রামের বাড়ির কথা বলছিলাম।

ও। কী বলছিলো?

বলছিলো, ওর মালীর কাছে নাকি পুজোর আগে চাঁদা চাইতে এসেছিলো ইলেকট্রিক অফিসের মিস্তিরিরা। মালী বলেছিলো, বাবু তো এখানে থাকেন না। এবারে পুজোর সময়েও আসবেন না। যখন আসবেন তখন আপনারাও আসবেন। বাবু লোক খারাপ নন। চাঁদা নিশ্চয়ই দেবেন আপনাদের। মালী বলছে, এই রাগেই মাসের বিল চারশো টাকা করে দিয়েছেন ওঁরা প্রতি মাসে। এই নইলে অ্যাড-মিনিস্ট্রেশান! পৃথিবীর কোনো অসভ্য দেশেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। আমরা সবই সহ্য করে যাই, তাই এই অবস্থা। এমন লজ্জাকর দৃষ্টান্ত বড় বেশি নেই। নিজেকে বাঙালী বলে ভাবতেও লজ্জা করে।

এর কারণ পোলিটিকাল .....

কারণ নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো কেন? যেটা ঘটনা, সেটাই বলছি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও সেরকমই। টেলিফোন তো চিরদিনই এমন। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়েই বসে আছেন তাঁরা। কাজ করতো দুটি ডিপার্টমেন্ট। স্টেটের ফায়ার ব্রিগেড আর সেন্ট্রালের পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট। সেই পোস্টাল ডিপার্টমেন্টও গোল্লায় গেছে। তবে ওঁদের প্রতি খুব অন্যায়ও করা হয়েছে। ওঁদের দায়িত্ব কর্তব্য অনুযায়ী যা মাইনে পাওয়ার কথা তা কোনোদিনই পাননি। আর এদিকে ব্যাঙ্কে ছাখ। সারাদিন প্রায় পিক্‌নিক করেও শহরের ন্যাশানালাইজড ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মাইনে কী রকম। কোনো প্যারিটি নেই, যোগ্যতার, শ্রমের অ্যাপ্রিসিয়েশান নেই। এমনি করেই তো কাজের

লোকও নিষ্কর্মার ধাড়ি হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে এই ক্যাওটিক সিচুয়েশানে পড়ে। কি খাবি সোম ?

যা খাওয়াবি। তুই একা থাকিস ? বিয়ে করিসনি।

নাঃ।

কেন ? এতো বয়সেও ? কোনো রহস্য ?

না। ছোট ভাই আছে। বিয়েও করেছে। ছেলেও হয়েছে একটি।

বাঃ। তবে তো সংসার আছেই, স্ত্রী না থাকলেও।

তা আছে। আর তোর ?

আমি ? আমার সংসারী হতে হতেও হওয়া হলো না।

কীরকম ?

জানিস তো, বাবা রিফ্যুজী হয়ে এসেছিলেন। একটি সলিসিটরস্ ফার্মে অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক ছিলেন। তাও মারা গেলেন যেদিন আমি চাকরিতে জয়েন করি তার তিনদিন পরেই ! এক দিদির বিয়ে বাবাই দিয়ে গেছিলেন, কিন্তু তিন বোন ছিলো আমার ভাগে। তাদের সবাইকে এক এক করে গ্রাজুয়েট করিয়ে বিয়ে দিলাম।

ভগ্নীপতিরা কি করে ?

প্রথমজন ওভারসিয়ার ছিলো ! কিন্তু হাতের রেখা খুব ভালো। মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এর ব্যবসা করে সে এখন প্রায় কোটিপতি !

বাঃ।

দ্বিতীয়জন ন্যাশানালাইজড্ ব্যাঙ্কে আছে। এখন অফিসার। গাড়ি কিনেছে। নাটক করে বেড়ায়। ব্যাঙ্কে আড্ডা মারতে যায় রোজ কিছুক্ষণের জন্যে। সেও আছে ভালো। আমার ঐ বোনও নাটক করে। ওদের জীবনযাত্রাও বেশ নাটুকে। নিয়মিত মদ্যপান করে। আস্তে আস্তে হাই-সোসাইটিতে উঠছে। জীবনের পরম লক্ষ্য তাই।

আর তৃতীয়জন ?

সে ব্যাটা একটা ইডিয়ট। সি. এম. ডি. ওর এঞ্জিনীয়র। কিন্তু

এক পয়সাও বানায়নি। যখন ছোকরা ছোকরা এঞ্জিনীয়াররা সব সল্ট লেকে, বাঁশদ্রোণীতে বাড়ি করে ফেলেছে, রেস-এর মাঠ আর নানা নেশায় উড়ে বেড়াচ্ছে তখন সুবোধের আমার সংসারই চলে না। চুঁচুড়োতে বাড়ি। বিধবা মা এবং একটা ছোট ভাই-বোন নিয়ে থাকে। কিন্তু তোকে কি বলবো যুযু, সবচেয়ে শান্তিতে আছে আমার ঐ ছোট বোন, রমা। সততার কোনো বিকল্প নেই, বুঝলি। চারদিকে যাই দেখি না কেন আমরা, শুনি না কেন, টাকাটা সকলেরই দরকার নিশ্চয়ই, কিন্তু টাকা শান্তি দিতে পারে না যুযু। আমি ইনকামট্যাক্স ডিপার্ট-মেন্টের লোক ছিলাম। টাকাওয়ালা লোকদের সঙ্গেই কারবার ছিলো। অর্থই যে অনর্থর মূল এ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্রই সংশয় নেই।

যুযু বললো, বড় বেশি কথা হচ্ছে। তোকে কিছু খেতে দিতে বলি। তারপর চা খা। দুপুরেও খেয়ে যা এখানে। আজ পশ্চিমদিকে সূর্য উঠেছে, আমার সহোদর অমলচন্দ্র বাজারে গেছেন। বলেই ডাকলো, শ্রীলা।

দোতলা থেকে জবাব দিলো শ্রীলা, আসছি দাদা।

পচার মাকে ডেকে যুযু বললো, আমাদের দুজনকেই জলখাবার দিও।

শ্রীলা এলে বললো, এই যে আমার স্কুলের বন্ধু সোম। সোম ব্যানার্জি। আর এই আমার ভ্রাতৃবধূ শ্রীলা।

সোম দাঁড়িয়ে উঠে বললো, বাঃ বাঃ। তোমাকে যে-কেউ যখন তখন বিয়ে করতে পারে বোন। তুমিই হচ্ছো আইডিয়াল বাঙালী বউ। রাঁধতেও জানো, গানও গাও, স্বামীর কাছে কিছু দাবিও নেই। দুটি খেতে-পরতে দিলেই যথেষ্ট। এমন বউ বাংলার ঘরে ঘরে হোক।

শ্রীলা হাসবে কিনা ভেবে বোকার মতো একটু হাসলো।

যুযু বললো, সোমও আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে শ্রীলা। এই বলার জন্যেই ডাকা তোমাকে।

শ্রীলা বললো, খুব ভালো কথা।

শ্রীলা চলে যেতেই যুযু বললো, তুই একটু বোস। আমি আসছি।

ভেতরে গিয়ে সিঁড়ির মুখে ধরলোও শ্রীলাকে। বললো, কিছু মনে কোরো না। ওর চাকরি চলে গেছে। তাই মাথায় একটু গোলমাল মতো হয়েছে। মনে করোনি তো কিছু? এর পরেও যদি কিছু বলে তো মনে কোরো না।

যুযু বসবার ঘরে ফিরে এলে সোম বললো, ভ্রাতৃবধূকে বলে এলি?

কি বলে আসবো?

এই! আমার মাথার গোলমাল আছে। ঘুষ খেয়ে চাকরি গেছে।

যুযুধান অবাক হয়ে গেলো। বললো, কী যা-তা বলছিস।

ঠিকই বলছি। তবে বলে ভালোই করেছিস।

যুযু মাথা নামিয়ে নিলো।

তারপর বললো, তোদের এই ফিফটিসিক্স-জেটা কি জিনিস?

ওরে বাবা। সে এক সাংঘাতিক জিনিস। সংবিধানের একটি ধারা এটি। এর বলে প্রেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া যে কোনো অসৎ, অক্ষম, অকার্যকর সরকারী চাকুরের চাকরি যখন-তখন খেয়ে নিতে পারেন। অনেক লোকেরই চাকরি গেছে এই ধারার গিলোটিনে। শুনেছি তাদের মধ্যে কারো কারো অসততার বদনামও ছিলো। আমারও ছিলো বদনাম। তবে ঘুষ খাবার নয়। অপ্রিয় সত্য কথনের। আমার ঘুষ-খোর ওপরওয়ালারা আমাকে কোনোদিনও দেখতে পারতেন না। পারতেন না বহু ইনফ্লুয়েনসিয়াল্ অ্যাসেসী। অনেক কলিগও। তবে চাকরিটা যে ঠিক কি করে গেলো সে কথা তোকে বলবো বলেই আসা। তুই তো সাহিত্যিক, ইচ্ছে করলে তুই আমাকে নিয়ে মস্ত বড় একটি উপন্যাস লিখতে পারবি। প্লট দেবো তোকে।

যুযু বললো, আমার নিজের মাথাতেই যেসব প্লট জমে আছে তা লিখতেই একটি জীবনের উপর আরেকটি জীবন দরকার। অন্যের প্লট

নিয়ে কি করবো বল ? তবে তোর কথা শুনতে কোনো আপত্তি নেই। জীবনের মাপ বড় হবে তাতে।

বাঃ। বেশ বলেছিস। জীবনের মাপ !

পচার মা চিঁড়েভাজা আর ওমলেট নিয়ে এলো।

যুযু বললো, নে সোম। শুরু কর।

হ্যা। ভালোই হলো। কাল রাতে খাওয়াই হয়নি। ক্ষিদেও পেয়েছিলো খুবই।

কেন ? খাওয়া হয়নি কেন ?

ঐ। ইচ্ছে করলো না। কে আর রাঁধে বাড়ে বল ? সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবার পর। আমার একটা কাজ দরকার। যে কাজে অনেক পরিশ্রম কিন্তু যে কাজে অন্যায় করে একজন মানুষের ঘাড়ে চুরির কলঙ্ক চাপানো হয় না।

চা কি আনবো ? পচার মা বললো।

হ্যাঁ নিয়ে এসো। যুযু বললো।

এটা খেয়ে নিয়েই কি তোকে বলবো গল্পটা যুযু ?

এতো তাড়া কিসের ? তুই তো সারা দুপুরই থাকবি আমার কাছে, না কি ?

বেশ কিছুক্ষণ সোম যুযুর চোখে চেয়ে রইলো চিঁড়ে ভাজার বাটিটা নামিয়ে রেখে। তারপর বললো, আমার সঙ্গে কত বছর পরে তোর দেখা হলো রে ?

তা প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর হবে।

নো-ডাউট। দীর্ঘ সময়। আসলে যদি যোগাযোগ না থাকে তবে স্কুলের বন্ধুরা স্কুল থেকে বেরোবার পর এতোখানিই বদলে যায়, মানে বদলে গেছে বলে মনে হয় যে, একে অন্যকে মেনে নিতে, বিশ্বাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। তাই না ? এটাই স্বাভাবিক। স্কুলে, যে মুখচোরা ছিলো সে দুর্দান্ত মুখর উকিল হয়ে ওঠে। স্কুলে, যে পড়া-

শোনায় মেধাবী ছিলো সে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে থাড ক্লাস পায়। যে গরীব পরিবারের ছিলো সে এই ব্যবধানে প্রচণ্ড বড়লোকের পরিবার-ভুক্ত হয়ে যায়। যে সৎ, সে অসৎ; যে অসৎ, সে সৎ। তেইশ বছর সময়টা মানুষের জীবনে বড় কম সময় নয়। কী বল ?

হঠাৎ এসব কথা ?

যুযু বললো।

হঠাৎ নয়। তোর ও আমার তুজনকে তুজনের আরো ভালো করে জানা উচিত। আমি চাই না যে. এই বয়সে এসে, এতো মার ও পোড় খাবার পরও তুই আমার কাছে বা আমি তোর কাছে কোনোরকম সন্দেহ তুজনের মধ্যে রেখেই পুরোনো সম্পর্ককে আবার জোড়া লাগাই।

কিসের সন্দেহ ? তুই কি বলছিস ?

আমি জানি যে, তুইও জানিস যে, আমি কি বলছি। আজ আমি উঠবো।

সে কি রে ? সোম। তুই কিন্তু···

চা নিয়ে এলো পচার মা।

চা খাবি না ?

কেন খাবো না ? চা খেয়েই যাচ্ছি। আমি তো ঝগড়া করে যাচ্ছি না, ভালোবেসেই যাচ্ছি। তুই একদিন আমার কুঁদঘাটের বাড়িতে আসিস। এই আমার কার্ড। দাঁড়া শালার ডেসিগনেশানটা কেটে দিই আগে। হ্যাঁ। তুই এলে, আমার পারিপার্শ্বিকে আমাকে দেখলে, তারপর আমাকে বুঝতে সুবিধে হবে। তোর স্কুলের বন্ধু সোমকে বিশ্বাস করতে সুবিধে হবে।

বলেই, চায়ের কাপটা ঠকাস করে তেপায়াতে নামিয়ে রেখেই বললো, চলি রে !

উঠে দাঁড়িয়েই কী যেন বলবে বলে তাকালো যুযুর দিকে। যুযুও দাঁড়িয়ে উঠেছিলো।

সোম বললো, তোর ভ্রাতৃবধূ শ্রীলাকে বড় ভালো লাগলো। ওকে কোথায় যেন দেখেছি আগে। কে জানে! স্বপ্নেও দেখে থাকতে পারি। তবে দেখেছি নিশ্চয়ই। যাক। ভাববার চেষ্টা করব কোথায় দেখেছি আগে। ভাববো। চলি রে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সোম বললো, যদি আসিস তো সন্ধ্যের দিকে আসিস। সারাটা দিন চরেবরেই বেড়াই। আর শোন্। শ্রীলাকেও বলিস কথাটা।

কি কথা?

যে, ওকে আগে আমি দেখেছি। কোথায় যে, তা মনে করতে পারছি না। ওকেও একটু ভাবতে বলিস। ওর বাঁদিকের বাহুতে তিনটি কালো তিল আছে কিনা জিগেস করতে পারবি? ওঃ সরী। তুই তো ভাসুর ঠাকুর। তাহলে আমিই কোনোদিন। ধ্যাস্স। আমি তো ভাসুর ঠাকুরের বন্ধু। তাহলে ··তুসস্ শালা। বড় কেচাইন্ হলো দেখছি।

সোম যখন চলে যাচ্ছিলো তখন তার সুদর্শন তরুণ চেহারা পেছন থেকে দেখতে দেখতে যুযুর মনে হলো এ কোন্ নতুন বিপদে পড়লো ও আবার। প্রার্থনা করলো যুযু, সোম যেন আর না আসে কখনও।



পাঁচ



গত পরশু অপরেশদা মারা গেলেন। হয়নি কিছুই। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হরিশ মুখার্জি রোড পেরোবার সময় মিনিবাস চাপা দিয়ে যায়। মিনিবাস কলকাতাতে রোজই মানুষ চাপা দেয়। সেই পাড়ার মানুষ কয়েক ঘণ্টার জন্য বিক্ষুব্ধ থাকেন। পরদিন সকালে মিনিবাসে করেই অফিসে যান এবং ড্রাইভারকে এ কথাও বলেন: "একটু চেপে চালান দাদা, অফিসে লেট হয়ে যাবো।" কিছুদিন বাদে অফিস যাওয়ার তাড়ায় অথবা বাড়ি ফেরার, আবার কেউ চাপা পড়ে। চলে এমনি করেই।

কেওড়াতলাতেও গেছিলো যুযুধান। ইলেকট্রিক চুল্লীতে খুব ভিড়। বর্ষায় বুড়োবুড়িরা অনেকেই টেঁসে যান। ঘণ্টাচারেক পরে টার্ন এলো। অপরেশদা যুযুধানের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় ছিলেন।

ডানলপে কাজ করতেন। ঢুকেছিলেন রাঘব বোসের আমলে, রাঘব বোস যখন চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পরে তো ফিন্যান্স ডায়রেক্টরও হয়েছিলেন। সায়েবরা তখনও ছিলো। তারপর ঘন ঘন মালিকানার হাত বদল হওয়াতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও একটু চিন্তিত ছিলেন। সেই সব কথা ভাবতে ভাবতেই বোধহয় রাস্তা পেরোচ্ছিলেন। দেরি করে বিয়ে করেছিলেন। ছেলেটা এবার ক্লাস টেন-এ উঠেছে।

ইলেকট্রিক চুল্লীর লোহার পাল্লাটা তুলতেই লাল গরম আগুনের মধ্যে যখন বাঁশের চালির উপরে শুইয়ে-রাখা অপরেশদাকে ঠেলে দেওয়া হলো ছেলে মুখাগ্নি করার পর, তখন ঠিক পাশে দাঁড়ানো

যুযুধানের অপরেশদার জন্য যতটা না কষ্ট হলো তার চেয়ে অনেকই বেশি কষ্ট হলো ওর নিজেরই জন্যে। হঠাৎই এ কথা মনে হলো যে, এই ইলেকট্রিক চুল্লীই জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য। ও-ও আর পাঁচটি বছরের মধ্যে অথবা তার আগেই এখানে ঢুকে যেতে পারে অবলীলায় অথচ এ জীবনে করার মতো কিছুই করা হলো না। শুধু পাঁয়তাড়া করেই জীবন গেলো। মহড়াই সার। নাটক আর মঞ্চস্থ হবে না।

ওর খুব খারাপও লাগতে লাগলো এ কথা ভেবে যে, মৃতের প্রতি শোক না জানিয়ে ও নিজের কারণে শোকমগ্ন হয়ে উঠলো নীচ স্বার্থ-পরের মতো। প্রতিবেশী এবং অপরেশদার আত্মীয়রাও কতক্ষণে কাজ শেষ হবে সেই অপেক্ষাতে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন। প্রত্যেকেরই কাজ আছে। অপরেশদা যখন চুল্লীর ভিতরে যাবার জন্য লাইনে শুয়ে অপেক্ষা করছিলেন তখনও খুব কম মানুষই তাঁকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মানুষের মৃত্যুর এতো অল্পক্ষণের মধ্যেই যদি অন্য মানুষ তাকে ভুলে যায় তবে জীবনে তো জীবনটুকুই পরম সত্য, মরণটুকুই মিথ্যা। এমনই একটি অনুভূতি হলো যুযুধানের মধ্যে।

ইতিমধ্যে অপরেশদার একজন বড়লোক আত্মীয় এলেন একটি কন্টেসা গাড়িতে করে। সাদা রঙ কন্টেসা। তাঁকে কখনও দেখেনি পাড়াতে, হয়তো গলিতে গাড়ি ঢোকে না বলেই। তিনি নাকি খুব বড় এক্সপোর্টার। তাঁকে দেখে সকলেই অপরেশদাকে ছেড়ে তাঁর কাছে চলে গেলেন। উর্দিপরা ড্রাইভার ফুল নামালো সেলোফেন কাগজে-মোড়া। তিনি বার চারেক নীরবে চার রকম মুখভঙ্গী করলেন। এমন ঘটনার জন্য অনুশোচনা, অনুতাপ, দেরি করে আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং অপরেশদা চলে গেলেন বলে দুঃখ। যে-কোনো উঁচুদরের পেশাদার অভিনেতার চেয়েও ভালো অভিব্যক্তি ফোটালেন চোখে-মুখে। তারপর পঞ্চমবার, হতাশার।

হতাশার অভিব্যক্তি ফুটিয়েই তিনি চলে গেলেন।

চলে যখন গেলেন, তখন তাঁর জন্যে যুযুধানের খুবই কষ্ট হলো। কারণ আশেপাশের অনেকেই বললেন, গাবুদা যেন আমাদের আর অপরেশদাকে ধন্য করে দিয়েই চলে গেলেন।

একজন বললেন, কণ্টেসা গাড়ি ফুটোবার আর জায়গা পায় না।

আরজন বললেন, গত মাসে ছেলেটার একটা চাকরির জন্যে গেছিলুম। খালি বাতেল্লা। ডুস্‌স শালা বড়লোক আত্মীয় দিয়ে কী হয়!

যুযুধানের মনে হলো, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই বড়লোক না-হলে দু-একজনের বড়লোক হবার মতো পাপ এবং মন্দ ভাগ্য আর কিছুই বোধহয় হয় না। সে-মানুষ যতই অন্যকে জড়াতে চাক, বুকে চেপে ধরতে চাক, অন্যরা সকলেই ঈর্ষায়, চাপা দুর্বোধ্য অভিযোগ অভিমানে দূরে সরে সরে যায়। মানুষে বড়লোকের বাইরের সুখটাই দেখে। তার পরিশ্রম, জীবনযাত্রা এবং দুঃখ সম্বন্ধে কোনো খোঁজই রাখে না। বড়লোক যে ও নিজে হয়নি, এই কথা মনে করে খুবই আশ্বস্ত হয় যুযুধান। গরীব থাকার তুলনায় বড়লোক হওয়া অনেকই কঠিন তো বটেই; কষ্টেরও।

অপরেশদার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুরাও অপরেশদাকে নিয়ে কোনো-রকম আলোচনা করছিলো না। আসন্ন লিগের খেলা, টি. ভি. সিরিয়া-লের ভালো-মন্দ, মাছের দর, রাজীব গান্ধীর ভবিষ্যৎ, এইসব নিয়েই আলোচনা হচ্ছিলো। গরমের সময়ে যে দু'জন কাশ্মীর এবং আলমোড়া-রানীখেত-নৈনিতাল বেড়াতে গেছিলেন সপরিবারে, তাঁরা সেই বেড়িয়ে-আসার খরচ এবং ছিন-ছিনারীর রোমহর্ষক ধারাবিবরণী দিয়ে শবযাত্রী-দের মনে শিহরন এবং ঈর্ষা দুইই ক্ষণে ক্ষণে অলটারনেটলি জাগিয়ে দিচ্ছিলেন। ওঁদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো যে, ইচ্ছা করেই ওঁরা অমন করছিলেন। অন্যের মনে ঈর্ষা-উদ্রেক করার মতো গভীর আনন্দ, সর্বস্ব-হৃত বাঙালীর আর বড় বেশী যে নেই।

যুযুধান অপরেশদার ছেলেকে বলে দাহ সম্পূর্ণ হবার আগেই চলে এলো। নিজের মধ্যে হঠাৎই এক ব্যস্ততা অনুভব করছিলো। কিছু একটা করতে হবে। ওর নিজের জন্যে খারাপও লাগছিলো, যুনীর জন্যেও খারাপ লাগছিলো। সময় চলে যাচ্ছে বলে ভীষণভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করছিলো।

যুযুধান ঠিক করলো, যাওয়ার সময়েই রাজা বসন্ত রায় রোডে প্রণবেশের বাড়িতে একবার ঘুরে যাবে শান্তিনিকেতনের জমির ব্যাপারে ও যে প্রচণ্ড "সীরিয়াস", সে কথা জানাতে। তারপরই ভাবলো, শ্মশান থেকে বেরিয়ে এই পোশাকেই যাওয়াটা ঠিক হবে না। কী সব আগুন-টাগুন ছুঁতে হয়, লোহা ছুঁতে হয়, মিষ্টি খেতে হয়। ওসব অবশ্য এখন কেউ মানেও না, জানেও না; তবে ওদের গলিতে এখনও ওসব রয়ে গছে। পাড়াতুতো মাসীমা-পিসীমারা, জেঠি-কাকীদের জন্যে।

কি মনে করে ঠিক করলো, না, এখান থেকে প্রণবেশের বাড়িই যাবে। হেঁটেই এলো রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ধরে। কিন্তু প্রণবেশ বা প্রণবেশের স্ত্রী বাড়ি ছিলো না। এক লাইন চিঠি লিখে এলো ওর মেয়ের কাছে "আমি কিন্তু জমির ব্যাপারে প্রচণ্ড সারিয়াস। যেদিন বলবে, সেদিনই শান্তিনিকেতনে যাবো। প্রয়োজন হলে ছুটি নিয়েও।"

বাড়ি যখন ফিরলো তখন শ্মশান-যাত্রীরা ফিরে এসেছেন। মাঝে মাঝে মৃদু কান্না শোনা যাচ্ছে। একতলার সিঁড়ির কাছে অনেক জুতো। যুযুধান ঢুকেও চলে এলো।

বাড়িতে শ্রীলা ছিলো না। ওখানেই গেছিলো। যুযুধান চান করতে গেলো। একটু গরম জল পেলে ভালো হতো। আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা এবং খুবই ম্যাজম্যাজে। রাতে ঠাণ্ডা জলে চান করলে জ্বর আসতে পারে। কিন্তু কাকেই বা বলবে এখন! পচার মা নিশ্চয়ই রুটি করছে। রুটি করা বন্ধ রেখে গরম জল করতে হবে, যদি বলে। তাই ঝামেলা

বাড়ালো না আর। চান সেরেই লুঙি আর বাড়িতে কাচা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে যখন ইজিচেয়ারে এসে বসলো তখন পচার মা চা নিয়ে এলো এবং সঙ্গে তিনটি চিঠি।

বললো, ও মা! এই জোলো আবহাওয়াতে তুমি ঠাণ্ডা জলে চান করলে গো দাদাবাবু!

যাকগে। রান্না করছিলে তুমি। রুটি করছিলে তো! চা যে এনেছো, এই যথেষ্ট।

তার জন্যে কি? ছোট বৌদি-ছোড়দার বাথরুমে তো গীজার লেগে গেছে। বললে না কেন? আমি পেলাসটিকের বালতি করে এক বালতি গরম জল এনে দিতাম আপনাকে।

গীজার?

হ্যাঁ! সাদা রঙ। গোল মতো। সুইচ টিপলেই লাল আলো জ্বলে আর জল গরম হলেই নিভে যায়। এবার থেকে বলবে, যখনই গরম জলের দরকার হবে।

বলবো।

পচার মা চলে গেলে চিঠিগুলো তুলে নিলো। একটি ইউনিট ট্রাস্টের চিঠি। ডিভিডেণ্ডের সময় এখনও হয়নি। ঠিকানা সংক্রান্ত চিঠি। একটি ইনস্যুরেন্সের প্রীমিয়াম। অন্যটি দিল্লীর।

চা-টা খেয়েই যুনীর চিঠিটা খুললো।

দরিয়াগঞ্জ
নিউ দিল্লী.

যুযুদা,

সেদিন তোমার জন্মদিনে সারা সকাল, দুপুর এবং রাত সাতটা অবধি চেষ্টা করেও তোমার লাইন কিছুতেই পেলাম না। এতো খারাপ লাগছে যে কী বলবো।

তুমি আমার অনেক অনেক ভালোবাসা ও আদর জেনো। এতোই খারাপ লাগছে যে, কিছুই লিখতে ইচ্ছে করছে না।

শান্তিনিকেতনের ব্যাপারে আমার পূর্ণ সায় আছে। তবে যত তাড়াতাড়ি পারো করো। আমার দেখার আদৌ দরকার নেই। তোমার রুচির ব্যপোরে আমার পূর্ণ আস্থা আছে। টাকা লাগলে, পত্রপাঠ জানাবে। তোমার নামেই কিনো। কিন্তু টাকা লাগলে জানাতে একটুও দ্বিধা কোরো না।

জমি কেনা হয়ে গেলে বাপ্পুকে দিয়ে প্ল্যান করিয়ে নেবো। ও আর্কিটেক্ট। দিল্লী থেকেই পাশ করেছে। একটি অহমিয়া মেয়েকে ভালো বেসে বিয়েও করেছে। ভারী চমৎকার মেয়েটি। যেমন সুন্দরী, তেমন সভ্য। সেও আর্কিটেক্ট। অনেকবারই আমাকে ওদের এখনকার গৌহাটির বাড়িতে যেতে বলেছে। তুমি অহমিয়া সংস্কৃতির সঙ্গে কতখানি পরিচিত জানি না, হয়তো একটুও নও, কিন্তু আসল আসাম তো আপার-আসামই। সেখানকার মানুষদের বেশ-ভূষা, আচরণ, বিনয়, রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতি আমার যে কী ভালো লাগে কী বলব !

তুমি যাই বলো, আমরা বাঙালীরা যতখানি না সত্যিকারের শিক্ষিত এবং সংস্কৃত, তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের বড়াই। বাঙালীর মধ্যে সত্যিই সাহিত্য পড়েন, গান শোনেন, পড়াশোনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এমন ক'জন আজকাল দ্যাখো ? সে বাঙালী আর নেই ! অহম্ দেশের এবং কলিঙ্গ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালীদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো তো নয়ই ; বরং বড়োই।

জোব্-চার্ণক সাহেব, সুতানুটি-গোবিন্দপুরে প্রথমেই নৌকো ভিড়িয়ে, বাঙালীদের প্রথমে ইংরিজি শিখিয়ে, জাতটির মাথায় ইংরিজি জ্ঞান আর শিক্ষা সমার্থক এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা যে-তৈরি করে দিয়ে গেছেন কবে, সেই মিথ্যে সুপিরিয়রিটি-কমপ্লেক্সে পুরো জাতটারই সর্বনাশ হলো। এখন ক'জন বাঙালী দেখতে পাও যুযুদা যিনি ইংরিজি

এবং বাঙলা দুটিই ভালো করে জানেন? বাঙালী বাঙলাও ভুলে গেছে; ইংরিজিও। নিজেদের কালচার গুলে খেয়ে, না-সরস্বতী, না-লক্ষ্মীর সাধনাতে কৃতকার্য হয়ে এখন গণেশ-পূজারীদের দ্বারে দ্বারে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দ্যাখো, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলাম! একেই কি বুড়ো হওয়া বলে?

যাই হোক জমি কিনে ফেলো। এবং কেনা হলেই আমাকে জানাও।

ভালো থেকো।

ভালো থেকো এই কথাটুকু বলা ছাড়া দূরে বসে তোমার জন্যে আর কিছুই তো করার নেই।

ইতি তোমারই যুনী।

চিঠিটা কোলের উপরে ফেলে যুযুধান অনেকক্ষণ বসে রইলো।

বাড়িতে কেউ নেই। অমল এখনও ফেরেনি। শ্মশানেও যায়নি। পাড়ার ছেলেরা এখন যুযুধানকে দেখে, দূর থেকে বলে, "অমুর দাদা যাচ্ছে।" অমুর দাদা-হওয়াটা সম্মানের না অসম্মানের ঠিক বুঝতে পারে না যুযুধান।

ছেলেবেলায় অমল খুবই গুণ্ডামি করতো। যখন ওর বছর দশেক বয়স তখন থেকেই সমবয়সী ছেলেদের ধরে বেধড়ক পেটান্ পেটাতো। তখন যুযুধান পথ দিয়ে গেলে পেছন থেকে বাচ্চা ছেলেরা বলতো, "দ্যাখ্, অমল গুণ্ডার দাদা যাচ্ছে।"

এখন নিজেদের মধ্যে ওরা কি বলাবলি করে কে জানে!

শ্রীলা না ফিরলে খাওয়া-দাওয়া হবে না। তাছাড়া রোজ তো আর প্রতিবেশীর মৃত্যু হয় না। অপরেশদার মৃত্যুটা শুধুমাত্র মৃত্যু হয়েই আসেনি ওর কাছে, বাঁচার এক নতুন প্রেরণা, জীবনের এক দ্যোতক হয়েই এসেছে। তাই, ভারী বাঁচতে ইচ্ছে করছে যুযুধানের।

বাঁচার মতো বাঁচা! এই দিনগত পাপক্ষয়, খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়ের বাঁচা নয়। অনেক জীবন্ত, উষ্ণ, অনুক্ষণ উৎসাহের মধ্যে বাঁচা।

যুনীকে চিঠি লিখতে বসলো যুযুধান। আপাততঃ ওর জীবনটা যুনীকে চিঠি লেখার মধ্য দিয়েই সবচেয়ে বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই চিঠির অক্ষরগুলির মধ্যে ও নিজেকে যতখানি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত মনে করে তা অন্যসময়ে কখনওই করে না।

•

কলকাতা

যুনী কল্যাণীয়াসু,

তোমার টেলিফোন যে আসেনি তার দায় তোমার নয়। দোষও নয়। দিল্লী-বম্বেতে বসে কলকাতার টেলিফোনের অবস্থার কথা তোমরা অনুমান করতে পারবে না। বাঙালী জাতটার আত্মসম্মান বস্তুটি চলে গেছে পুরোপুরি, যারা বাঙলার De-facto মালিক তাদের তা অনেক আগেই গেছে। এই বাঙালীকে সবদিক দিয়ে নষ্ট করার পেছনে এই মালিকদের মদতও কম নেই। টাকাই তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা। টাকাই সম্মান, যশ, ক্ষমতা সব কিছুর উৎস। রেলের টিকিট থেকে শুরু করে সিনেমার টিকিট, এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই এই মালিকরাই কালোবাজারের প্রথম সূত্রপাত করে। 'ঘুষ-ঘাষ' এবং 'জান্-চিন্'-এর সংস্কৃতিতে এঁরাই প্রথম এমন ব্যাপক-ভাবে একটি জাতির চরিত্র এবং সমৃদ্ধিকেও পুরোপুরি নষ্ট করতে কাজে লাগায়। আজকে অবশ্য এসব ব্যাপার আলোচনারও বাইরে চলে গেছে কারণ এটাই এখন সত্য, সরল সত্য যে, বাঙলার মালিক আর বাঙালী নেই। "বাঙলাদেশ"ই একমাত্র দেশ পৃথিবীতে যেখানে বাঙলা ভাষাভাষীরাই সব। তাদের কথাই শেষ কথা। এটা ভাবলেও ভালো লাগে।

কী বলতে বসে কীসব বলছি। বুড়ো আমি তোমার চেয়েও বেশি হয়েছি।

এখুনি একজনকে দাহ করে এলাম। আমাদের চারটে বাড়ি পরে থাকতেন অপরেশদারা। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। মিনিতে চাপা পড়েছিলেন হরিশ মুখার্জি রোড পেরোতে গিয়ে। অফিসের পর। চাপা পড়েছিলো পরশুদিন। পোস্ট মর্টেম করে কাটা-ছেঁড়া, ফোলা, বীভৎস মৃতদেহ আজ বিকেলে আত্মীয়-বন্ধুরা হাতে পেয়েছেন। পোস্ট-মর্টেম করতে এতো সময় কেন যে লাগে, কে জানে? সবাই সব দেখে কিন্তু চুপচাপ মেনেও নেয়। কোনো অন্যায়েরই প্রতিবাদ হয় না এখানে। এখানে মূক, নির্বাক, আত্মসম্মানহীন, নিজস্বার্থপরায়ণ এক প্রজাতির বাস, তাদের নাম বাঙালী। যারা নিজের পায়ে অন্যের জুতোর চাপ না পড়লে বিচলিত হয় না, নিজের বোন শ্লীলতা-হৃত না হলে উত্তেজিত হয় না, নিজের দাদা বা বাবা অপমানিত না হলে অপমান বোধ যাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, এই প্রজাতি সেই বাঙালীই। একতা বলতে যাদের মধ্যে কিছুমাত্র নেই। পরশ্রীকাতরতা এবং ঈর্ষাই যাদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এসব ভাবনা ভেবে বিচলিত, উত্তেজিত বা অপমানিত বোধ আমিও করি না কারণ সময় পেরিয়ে গেছে। আর সময় নেই। ভাগ্যকে বিনা-প্রতিবাদে মেনে নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে একদল বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন কয়েক যুগ আগে আর আরেক দল পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাচ্ছেন। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত।

আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে পুরো কলকাতা শহরে—শ্যামবাজারের পাঁচমাথা বা চৌরঙ্গীতে, বা রাসবিহারীর মোড়ে তুমি কোনো বাংলা শব্দ উচ্চারিত হতে পর্যন্ত শুনবে না। বাঙালীর উদ্বাসন সম্পূর্ণ হবে ততদিনে সমস্ত বাংলা থেকে। যাঁরা থাকবেন, তাঁরা ডেইলি প্যাসেঞ্জারী করে ভোরবেলা কলকাতাতে জীবিকার কারণে আসবেন এবং ক্লান্ত,

ঘর্মাক্ত, বিরক্ত হয়ে গভীর রাতে ফিরে যাবেন। আমরা এই লজ্জাকর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থেকে যাবো।

অপরেশদা চলে গিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন যে, থাকাটাই মিথ্যে আর যাওয়াটাই সত্যি। আমাকে না-বলেও বলে গেলেন যে, জীবনটাকে জীয়োনো-কইমাছের মতো হাঁড়ির ছলকানো পিছল-জলের মধ্যে ঝপাং-খপাং করে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষতবিক্ষত করে করে তাকেই বেঁচে থাকা বলে ভুল করার সময় আর নেই। এবারে যে কটি দিন আছে, সত্যি সত্যিই বাঁচতে হবে।

তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না যুনী? এবারে আমাদের বাঁচতে হবেই। জীবন বড় পুলক ভরে ডাক দিয়েছে! আর নষ্ট করার সময় নেই।

আমার কলিগ প্রণবেশের বাড়ি গেছিলাম আজই শ্মশান থেকে। বাড়ি ছিলো না ও। চিঠি দিয়ে এসেছি। যে-কোনোদিন শান্তিনিকেতন যেতে পারি। তুমি এবার চাকরি ছাড়ার কথা ভাবো। শান্তি-নিকেতনেও চেষ্টা করে দেখবো। তুমি বাংলা ভাষায় এম এ এবং ডক্টরেটও, তোমার কি একটা চাকরি জোটে না শান্তিনিকেতনে?

ভালো থেকো।

ইতি তোমার যুযুদা।

পুনশ্চ—অমলের চাল-চলন এবং জীবনযাত্রা রীতিমতো রহস্যময় হয়ে উঠছে দিনে দিনে। বিনা-পরিশ্রমের অঢেল পয়সাও দেখতে পাচ্ছি। তোমার দূরসম্পর্কের বোন শ্রীলা, যেহেতু টাকা পাচ্ছে সেই হেতু বোধহয় টাকার উৎস সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করে না অমলকে। অবশ্য জানি না সে কীভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা।

এই বাড়িতে থাকাই হয়তো মুশকিল হবে আমার পক্ষে বেশিদিন। সবসুদ্ধ্‌ পাঁচ কাঠা জমি। মালটিস্টোরিওয়ালাদের বিক্রী করা যেতে

পারে যখন তখন। কিন্তু এতো বছর যে প্রলোভন ঠেকিয়ে এসেছি, গলির প্রত্যেককে দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি ; তা আমি নিজে করি কি করে ?

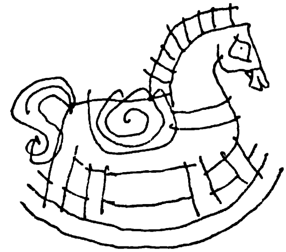
এ পাড়ায় যত বাড়ি হচ্ছে তাতে ফ্ল্যাট কেনার শর্ত হচ্ছে যে নিরামিষাশী হতে হবে। লিখিত নিয়ম নয়, অলিখিত নিয়ম। তাছাড়া আজকাল কলকাতার বুকে ফ্ল্যাট কেনার মতো বড়লোক বাঙালী কজনই বা আছেন ? তবে যাদের জমি, তারা চাইলে অবশ্য একটি বা দু'টি ফ্ল্যাট ওঁরা দিচ্ছেনও। কিন্তু জেনারেটর নিয়ে মেইনটেন্যান্স খরচ আর করপোরেশান ট্যাক্স দিতেই তো প্রাণান্ত হবে। তাই বাঙালীরা ফ্ল্যাট পেলেও ফ্ল্যাট রাখতে পারছে না।

আমাদের কলকাতা করপোরেশনের ভূমিকাও এই শহর থেকে বাঙালী উৎখাতের পেছনে আদৌ বড় কম নয়। তাঁদের এই পুণ্যকর্মের কথাও বাঙালীর ইতিহাসে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই লেখা থাকবে।



॥ ছয় ॥

রবিবার সকালে সোম-এর কার্ডটা পকেটে নিয়ে হাজরার মোড় অবধি হেঁটে এসে বাস ধরলো যুযুধান কুঁদঘাটের।



কনডাক্টরকে জিগেস করলো কোথায় হবে জায়গাটা। কনডাক্টর বললো, তা জানি না দাদা, তবে এমন জায়গায় নামিয়ে দেবো যে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন। মনে হচ্ছে কুঁদঘাটের শেষ প্রান্তরও শেষ প্রান্তে।

এর আগে কখনও আসেনি যুযুধান কুঁদঘাটে। মোড়ের পানের দোকানে জিগেস করতে দোকানী বাঁহাত দিয়ে পাশের গলিটা দেখিয়ে দিলো। বললো, অনেকটা যেতে হবে। একটা অটো-টটো নিলে ভালো করতেন।

অনেকটা মানে যে এতোখানি, ঠিক অনুমান করতে পারেনি যুযুধান। যেখানে এসে পড়লো সে জায়গাটার চেহারা গ্রাম গ্রাম! এখনও বেশ কিছু গাছগাছালি আছে। টিনের চালের বাড়ি এবং সবচেয়ে বড় স্বস্তির কথা এই যে একটিও বহুতল বাড়ি নেই। এক একটি বহুতল কংক্রীটের বাড়ির এফেক্ট এক একটি পাহাড়েরই মতো। পুরো কলকাতার আবহাওয়া যে এমন বদলে গেলো তার পেছনে এই বহুতল বাড়িগুলোর মস্ত ভূমিকা আছে। জলের জন্যে এখন পাইপ নামাতে হচ্ছে অনেকই গভীরে। বড় বড় গাছওয়ালা পাখি-ডাকা লন ও বাগানওয়ালা বাড়িগুলোর সব গাছ কেটে পাখিদের নিরাশ্রয় করে কংক্রীটের পাহাড় গজিয়ে গেলো চারদিকে, আকাশ পর্যন্ত দেখা যায় না। এই বাড়িগুলোকে ঘেন্না করে যুযুধান।

একটি চায়ের দোকানের সামনে রবিবারের সকালে কয়েকটা ছেলে বসে ছিলো। গত শনিবার তারা রেসের মাঠে গেছিলো। হার-জিতের হিসেব করছিলো নিজেদের মধ্যে। যুযুধান সোম-এর নাম বলে, বাড়ির ঠিকানা বলে শুধোলো, ওরা জানে কি না?

একটি ছেলে বললো, ও, পাগলা ইনকামট্যাক্স?

যুযুধান হেসে বললো, পাগলা বলা কি ঠিক? পাগলাটে বরং বলা ভালো।

অন্যজন বললো, পাগলা রে পাগলা, সাঁকোটা নাড়াস্ না।

আরেকজন দূরে দেখিয়ে বললো, ঐ যে কচুরিপানাভরা পুকুরটা দেখছেন, তারই পাশে যে ম্যাড়ম্যাড়ে-হলুদ একতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওটাই ওঁর বাড়ি। বুঝেছেন তো? ঐ মস্ত গাছটার ঠিক তলায়।

বাড়িতে কি আছেন এখন?

অন্যজন বললো, যাচ্চলে। তা আমরা কি করে জানবো? আমরা কি পাগলা ইনকাম ট্যাক্সের বউ? না, মাগ্?

যুযুধান একবার ছেলেটির দিকে চেয়ে আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চললো।

কয়েক পা যেতেই যুযুধানের কানে এলো, ওরে দেখ তো, এ এ লোকটাকে অমলের দাদা বলে মনে হচ্ছে না? এ পাড়াতে ছোঁক-ছোঁক করছে কেন?

আরেকজন বললো, অমল বলে, দাদা আমার ভারী সতীপনা করে। এই সেই দাদা। একই দাদা তো অমলের।

প্রথমজন বললো, সতী! শালা—। দেশে ট্যাড়া পেটালে সতী মেলে না মেয়েদের মধ্যেই আর এ তুম্বো পুরুষ কিনা সতী? কী দিনকাল হলো মাইরী।

অন্যজন বললো, অ্যাই তোরা চুপ কর। অমলের দাদা হলে কী হয় এই হচ্ছে সেই যুযুধান রায়, লেখক।

ছাড়্ শালা। আজকাল লেখক-ফেখকের কোনো খাতির নেই। হতো প্লেয়ার, কী ফিল্ম স্টার, তো বুঝতাম। চোর-ডাকাতেরও খাতির বেশি লেখকের চেয়ে। কী মাল ছড়াচ্ছে কে কোন্ কাগজে কার শালার পড়বার টাইম আছে? লেখা-পড়াই উঠে গেছে দেশ থেকে। কিছু মেয়েরা পড়ে। তাও যারা ভালো দেখতে নয়। ভালো চেহারার মেয়েরা তো সবসময়ই বুক্‌ড। তাদের ফালতু সময় কোথায় এসব পড়বার?

না না। উনি বড় লেখক।

জানলি কি করে? মা-ন-তু।

যাঃ শালা। বিজ্ঞাপনে কতো বড় বড় করে নাম ছাপা হয় দেখিস না? যুযুধান রায়। আজকাল 'নিরমা' বা 'গোল্ডকাফের' মতো লেখকও পায়দা করে বিজ্ঞাপন। বুয়েছিস। কে বড় কে ছোট তা মাল পড়ে বলতে হয় না।

কী যুক্তি। খবরের কাগজে তো পান-বাহারেরও বিজ্ঞাপন বড় বড় করে বেরোয়। তা বলে কি পান-বাহারও লেখক।

তুই শালা একটা থার্ড ক্লাস ইল্‌লিটারেট্। তুই তো বুঝিস ঘোড়া আর মেয়েছেলে।

ততক্ষণে যুযুধান অনেক দূরে চলে এসেছে। সব কথা যে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এমনও নয়। শুধু একটা কথাই ওর মাথায় ঘুরছে যে এই ছেলেগুলি অমলের বন্ধু অথবা ধান্দার অংশীদার। তারা যখন তাকে দেখেই অমলের দাদা বলে চিনে ফেলেছে তখন অমলকে তারা বিলক্ষণই চেনে। কথাটা মনে করেই বাঁদিকের বুকের কাছে এবং বাঁ হাতে ব্যথা বোধ করতে লাগলো যুযুধান।

এসে গেছে সোম-এর বাড়ি। সামনে সামান্য একটু পথ। পুকুর-টাতে কচুরিপানা ভরে রয়েছে। দুজন মেয়ে শাড়ির উপরে বুকের

কাছে গামছা ফেলে ঐ পুকুরেই ডুব দিতে নামলো। যুযুধানকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো।

একটা ডাহুক পাখি কচুরিপানার উপরে নাচতে নাচতে সরে গেলো। আন্দাজেই বুঝলো ডাহুক পাখি। ভারী ভালো লাগলো যুযুর।

একটা মস্ত গাছ। কী গাছ কে জানে? হলুদ বাড়িটার দেওয়ালে একটি কালো রঙা লেটার বক্স্। সোমের নাম লেখা তাতে।

কড়া নাড়তেই দুটো কুকুর ভেতর থেকে বন্ধ দরজার দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। তারা দরজায় নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো। ভেতর থেকে সোম-এর গলা শোনা গেলো। তারপর খড়মের শব্দ।

কুকুর দুটোকে ধমকে বললো, এই কুত্তার বাচ্চারা। মারবো এক লাথি। সর সর।

সোম আজকাল বড় খারাপ ভাষা ব্যবহার করে, স্কুলে পড়ার সময় একেবারেই অন্যরকম ছিলো। কে জানে! ওর জীবন এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক অতীতই বোধহয় ওকে এমন রুক্ষ করে দিয়েছে। অথবা এটা ভেক। লোক-দেখানো। তাও হতে পারে।

সোম দরজা খুলেই বললো, মাই ডিয়ার যুযু! হোয়াট আ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ! আয় আয় ভেতরে আয়।

যুযুধান ঢুকতে ঢুকতে বললো, ভারী সুন্দর জায়গায় তোর বাড়ি। কত্ত গাছ। এটা কি গাছ রে? এই মস্ত গাছটা?

আরে এটাও চিনিস না? এ তো বিলিতি আমড়া। তোকে দিয়ে দেবো কটা। বাড়ি গিয়ে অম্বল রেঁধে খাস।

সোম-এর পরনে একটি সবুজ আর সাদা খোপ-খোপ লুঙি। উপরে হাত-কাটা গেঞ্জী। শরীরের গড়ন এখনও খুবই মজবুত। বুক ভর্তি চুল।

সোম ডাকলো, সপ্তমী!

একটি বছর পঁচিশের মেয়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

সোম বললো, আগে দু কাপ চা কর। ওমলেট করে আমাদের দে। তারপর মাংসটা ভালো করে মাখ দেখি দই দিয়ে। আমি নিজে হাতে রান্না করব। আমার বন্ধু এসেছে। স্কুলের বন্ধু। যুযু।

মেয়েটি ভীত চোখে তাকালো যুযুর দিকে।

মনে মনে বললো, কী নাম রে বাবা! জুজু!

আয় আয়। আমরা উঠোনেই বসি! হাওয়া আছে।

মাটির উঠোন। একপাশে তুলসী মঞ্চ। সন্ধ্যামালতীর ঝাড়। যুঁই। এক কোণে একটি টগর গাছ। ছোট ছোট পাখি তাতে কিচির-মিচির করছে। বিলিতি আমড়া গাছটা ঝুঁকে আছে, উপর থেকে। বহু দূর অবধি চিকন-সবুজ ডালপালা ছড়িয়ে।

সামনের ঘরটা বসার ঘর। উল্টোদিকে রান্নাঘর। টিনের চালের। ডানদিকে শোবার ঘর। উঠোনের এক পাশে একটি কুয়ো এবং একটি টিউবওয়েল। কুয়োর চারপাশটা বাঁধানো। কাপড় শুকোবার দড়ি, আমড়া গাছের ডাল আর একটা বাঁশের মাঝামাঝি বাঁধা আছে।

অবাক হয়ে দেখছিলো যুযুধান কলকাতার মধ্যেও এখনও এমন জায়গা আছে দেখে, এমন বাড়ি আছে দেখে অবাক হচ্ছিলো।

আয় বোস। বলে, সোম দুটি হাতল-ওয়ালা ভীষণ ভারী শাল-কাঠের চেয়ার আনলো বসবার ঘর থেকে উঠোনে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বললো, ছাড় তো সপ্তমী, একটা টুল ছাড়। আমার বন্ধু পা রাখবে।

বলেই, একটা কাঠের টুল এনে যুযুধানের পায়ের কাছে রাখলো। বললো, অ্যাই, অ্যাই, অ্যাই যে। পা তুলে দে। আরাম করে বোস। ছেলেবেলায় তোদের বাড়ি কত আদর যত্ন পেয়েছি। মাসীমা কত খাইয়েছেন, তোর জন্যে কোনোদিন তো কিছুই করিনি। পা টিপে দেবো কি? বল?

যুযুধানের খুব লজ্জা করছিলো। ওকে এমন আর কেউ কখনও করেনি। সোম-এর কুকুর দুটো উঠোনে শুয়েছিলো পায়ের উপরে মাথা রেখে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিলো। তাতে তাদের নাকের সামনে থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছিলো। একটি মাছি এসে ওদের নাকে-কানে বসছিলো ভন্‌ভন্‌ করে। বিরক্ত হচ্ছিলো দুটি কুকুরই। একটি কালো আর একটি লাল।

কীরে যুযু কথা বলছিস না কেন?

বড় বেশি অবাক হয়ে গেছি বলেই বোধহয়। তোর ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বল। কলকাতার কোনো ইনকামট্যাক্স অফিসারকে এমনভাবে থাকতে তো দেখিইনি। থাকার কথা ভাবতেও পারি না।

ছিলাম। ছিলাম। এখন আর নেই। ও পরিচয়ে আমাকে ডাকিস না।

ঠিক আছে।

আমার বন্ধুদের কেমন দেখছিস?

কারা? কোথায়?

যুযুধান বললো।

এই যে। স্নেহ আর মমতা। স্নেহটা কালো। পুরুষ ওটা। লালটা মমতা। মেয়ে।

ওদের নামোচ্চারিত হতে দেখেই ওরা কান নাড়ালো।

সোম বললো, অনেক হয়েছে। চুপ করে শুয়ে থাক।

তারপর বললো, এখন বই আর রেকর্ড আর ক্যাসেট ছাড়া ওরাই আমার বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন, যাই বলিস। মানুষের উপর বিশ্বাস আমার একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। কুকুরের মতো প্রাণী নেই। এতো ভালবাসা, এতো কৃতজ্ঞতা। অথচ ভগবান শালা এই ফাসকেলাস ভদ্রলোকেদেরই আয়ু এতো কম দিলেন কেন, কে জানে? কচ্ছপ,

মানুষ এসব ওয়ার্থলেস জানোয়ারের এতো আয়ু দিলেন আর এদের ? ভালোবাসাটা পাকতে না পাকতেই কাঁদিয়ে চলে যাবে। জানি, চলে যাবে। তবু যতদিন থাকে। তবে এটাও ঠিক যে সেবা করে যাবে জেনারেশান আফটার জেনারেশান। ওদের ছেলে মেয়ে, নাতি পুতি, যতদিন অবধি আমি বেঁচে আছি এরা কোনোদিন আমাকে ফেলবে না। দু-বেলা দু-মুঠো খাবার দিলেই এই কৃতঘ্ন, তঞ্চক পৃথিবীতে এতো ভালোবাসা আর কে দিতো বল ?

ওঃ ভালো কথা। তোর ভাদ্রবৌ মুনিয়া কেমন আছে ?

মুনিয়া কে ?

আরে তোর ভাইয়ের বৌ।

শ্রীলা ?

ঐ তিলগুলোর কথা জিগেস করেছিলি ? ও সেদিন বলতেই ভুলে গেছিলাম, ওর ডান উরুতে দুটো বড় বড় লাল তিল আর বাঁদিকের পেছনে, মানে ছাপুতে সবুজ রঙের বাংলা পাঁচ-অক্ষরের মতো একটি জন্ম দাগ আছে। শুয়ে ভারী আরাম ছিলো ওর সঙ্গে।

যুযুধান উঠে পড়ে বললো, আমি কি চলে যাবো ? আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সম্বন্ধে এমন সব কথা শোনা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সোম বললো, বোস্। বোস্। আমার কথা ধরিস কেন রে ? আমি তো পাগল। সবাই জানে। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় ! ভুলে যা।

ভুলে যাই কি করে ? ভোলার মতো কথা তো তুই বলছিস না।

হঠাৎ সোম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বললো, মার গুলি শালা ! আমি আমার সমস্ত জীবনটা ভুলে যেতে পারলাম আর তোর ভাদ্রবৌ পয়সা নিয়ে লোকের সঙ্গে শুতো এই সামান্য কথাটা তুই ভুলে যেতে পারছিস না। আমি কি তার সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা বলেছি ?

সোম-এর উত্তেজনায় কুকুর দুটো তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কটমটে চোখে যুযুধানের দিকে চেয়ে রইলো।

আমার ছোট ভাইয়ের…

মার গুলি শালা। সংসারে কেউ কারো নয় রে যুযু। আমার জীবন দিয়ে শিখেছি কথাটা। তাই তোকে বলছি। এ আমার বইয়ে-পড়া কথা নয়। চোখের জলের কথা। যাকগে, ও প্রসঙ্গ। আমি আর তুলবোই না। আমার কি? তবে বড় সব সুখের দিনের কথা মনে পড়ে গেছিলো সেদিন ওকে দেখে, তাই…। তাই তো তোর বাড়িতে জলখাবার না খেয়েই চলে এসেছিলাম। জলখাবার খেলে যদি অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করতো! অব্যেস বড় খারাপ জিনিস রে ভাই। মুনিয়া আমার অব্যেস হয়ে গেছিলো!

একটু চুপ করে থেকে বললো সোম গম্ভীর গলায়, চলে এসেছিলাম, তোকে আহত করেছিলাম বলেও।

অন্য কথা বল্।

যুযুধান বললো।

সন্নী। এই সপ্তমী। বেশি করে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা আর ··

আমি কাঁচা লঙ্কা খাই না।

সে কী রে! কাঁচা লঙ্কাই তো জীবন!

আচ্ছা, তাহলে প্যাঁজ খাস তো?

তা খাই।

তাহলে প্যাঁজ, একটু দুধ, একটু চিনাবাদাম আর একটু ডালমুঠ ফেলে দিস বাবুর ওমলেটে। ভালো করে ফ্যাটাবি ডিম ভেঙে নিয়ে ওগুলো দিয়ে, তারপর নরম নরম থাকতে তুলে নিবি। পোড়াবি না। না পারিস তো বল, আমি যাচ্ছি।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে সপ্তমী নিচু গলায় কী একটা বললো, তার মানে সোমই বুঝলো।

বললো, ঠিক আছে। কর। আর হলেই আমাদের এনে দে। আগে ওমলেট। তারপর চা।

বলেই বললো, তোর ক'চামচ চিনি যুযু?

দু'চামচ।

বাবুর চায়ে দু'চামচ চিনি। আমার চায়ে চার চামচ। জানিসই তো!

এই বাড়ি তোর নিজের? যুযুধান শুধোলো।

হ্যাঁ। এই একটিই নিজস্ব সম্পত্তি আছে আমার। চাকরিতে ঢোকার দু'বছর পর কিনেছিলাম। কত করে কাঠা কিনেছিলাম বল তো?

কত?

শুনলে তুই ভির্মি যাবি। এসব জায়গায় যে পরে বাড়ি করে কেউ থাকবে তা তো ভাবেনি কেউই। শালা, আমিই কি ভেবেছিলাম। আমাদের আগের জেনারেশানের মানুষেরা ঢাকুরিয়া লেক, বালিগঞ্জকেই জঙ্গল দেখেছেন।

কত জমি আছে?

এক বিঘে ছিলো। দশ কাঠা বেচে তা থেকে এই বাড়ি করেছি। আর বাকি টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে রেখেছি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদিও পেয়েছিলাম লাখ দেড়েক মতো। পেনসান এ মাস থেকে পাচ্ছি। আমি যে নির্দোষ তা কর্তৃপক্ষ এখন বুঝেছেন। আমি কিছু বলতে যাইনি। তবে আমাকে রি-ইন্স্টেটও করবে বলে কথা হচ্ছে।

তাহলে তো ফিরেই যাচ্ছিস ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে।

দূর শালা। ওরা করলে করুক। লোকে জানবে যে আমি অন্যায় করিনি। কিন্তু চাকরি ফিরে পেলেও আর ফিরে যাবো না। আয়কর ভবনেও যাবো না আর এই জন্মে।

কেন? এখন তো যাস।

এখন যাই। আমার বিবেক পরিষ্কার বলে যাই। আমার কলিগ, জুনিয়র, সীনিয়র, সবাই আমাকে নির্দোষ বলে মানেন বলেই যাই। চাকরি ফেরত যেদিন দেবে সেদিন থেকেই সম্পর্ক ছেদ করে দেবো সকলের সঙ্গে। আমার কাছে যারা ভালোবেসে আসবে, তারা আসতে পারে। যেমন তুই এসেছিস। আমি কারো দরজায় বা ঐ ডিপার্টমেণ্টে আর যাবো না। শালা এতো বড় অন্যায় যেখানে হতে পারে একজন মানুষের উপর সেখানে মানুষের কোনো ভরসা নেই।

আসলে কী হয়েছিলো, বলবি না?

বলবো, বলবো। সবই একদিনে শুনে কি করবি? সব কথাই বলার বা শোনবার সময় চাই। আমার প্রতি যদি ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখিস তবে তো আবারও আসবি। বলবো কখনো। আমি ভালো এ কথা বলতে গেলে, তোকে বোঝাতে গেলে, অন্য একজন যে খারাপ বড়ই খারাপ, এ কথাও তো তোকে বলতে হবে। আসলে কোনো মানুষ সম্বন্ধেই আমার আর কোনো ইণ্টারেস্ট নেই। বিশ্বাস কর। আমার কালু-লালুর সম্বন্ধে আমার অনেকই বেশি ইণ্টারেস্ট পৃথিবীর যে-কোনো মানুষের চেয়ে।

এখানে জমি পাওয়া যায় আর?

খোঁজ করতে হয়।

কিরকম কাঠা এখন?

তা হাজার কুড়ি পঁচিশ তো হবে। আমার ঠিক জানা নেই রে। তুই যদি বলিস তো খোঁজ করতে পারি।

শান্তিনিকেতনে জমি পাচ্ছি পাঁচ হাজার করে কাঠা। তুই কি বলিস? নেবো?

নিয়ে নে। নিয়ে নে। দামের জন্যে নয়, প্রাণের আরামের জন্যে। যুযু, এখনও সময় আছে। প্রকৃতির কাছে ফিরে যা, গাছপালা, পাখি, ফুল, নদী, মাঠ; মনুষ্যত্বে ফিরে যা। পারলে এই কংক্রীটের জঙ্গল

ছেড়ে পালা, এই ইলেকট্রিসিটি থেকে, এই লোভ, এই নিয়ত-অসুখ ছেড়ে ; প্রাগৈতিহাসিক কালে ফিরে যা। যদি বাঁচতে চাস। প্রিয় নারী, প্রিয় মাটি, প্রিয় পালিত প্রাণী নিয়ে এই সুন্দর চাঁদ তারার ব্রহ্মাণ্ডে পরম শান্তিতে বাস কর। বাঁচতে কতটুকু দরকার হয় রে একজন মানুষের ? কতটুকু ? বড় শহর ছেড়ে এই সংঘাতিক শ্বাপদদের ভিড় থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচা।

তোর বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই ?

না। চারপাশের সব বাড়িতে আছে। আমি ইচ্ছে করেই নিইনি। আমাদের বাপ দাদারা তো দিব্যি চালিয়ে গেছিলেন। সুখ-শান্তি তো তাঁদের অনেকই বেশি ছিলো আমাদের চেয়ে। মরার সময়ও টুপ করে মরে যেতেন! জ্যান্ত অবস্থাতে শকুনের মতো একগাদা অর্থগৃধ্নু ডাক্তারেরা ব্লাড-প্রেসার, ব্লাড-সুগার, ক্লোরোস্ট্রোল, ইউরিক-অ্যাসিড, হার্ট, কিড্‌নী, ইসিনোফিলিয়া নিয়ে এতো হৈচৈ করে মানুষকে জীয়ন্তে মৃত করে রাখতো না। কথায় কথায় ছুরি ধরে পাঁচ দশ হাজার খসাতো না। মরে গেলে পাড়ার লোকে বলতো "উনি সন্ন্যাস রোগে মরিয়াছেন"। কী শান্তি ছিলো বলতো। শালার টি. ভি. ছিলো না, প্রচণ্ড ডেসিব্‌লে-বাজা সব কানের পর্দা ফাটানো গান-বাজনার রেকর্ড ছিলো না। শান্তি! কী শান্তি!

সপ্তমী বলে মেয়েটি স্টেইনলেস স্টীলের প্লেটে করে ওমলেট এনে দিলো।

যুযুধান বললো, আমি কিন্তু দুপুরে এখানে খাবো না। বলে তো আসিনি। তোর না হয় ঘর সংসার নেই। আমার তো ভাই আর তার বৌ আছে। দুপুরে খাওয়ার আগে না ফিরে গেলে তারা থানা পুলিশ করবে।

ভাবছিস্ তাই। শালা! তুই মরে গেলেও তোকে বারো ঘণ্টা মনে রাখবে না রে। বারো ঘণ্টাও মনে রাখবে না। যতদিন বেঁচে আছিস এই সব সুখ-কল্পনা করেই বেঁচে থাক।

তুই বিয়ে করিসনি সোম ?

করেছিলাম।

তাহলে ?

আমার বন্ধু আমার চাকরি এবং বউ দুইই একসঙ্গে নিয়ে নিলো। উল্টে আমাকে চোর বানালো। সে সব কথা থাক। খারাপ জিনিস নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।

তোর ছেলে মেয়ে ?

আছে। চুরির দায়টা যেমন আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলো, ছেলেমেয়ে দায়টাও তেমনই। তবে আমি তাদের আসল বাবা নই। পদবীটাই আমার। আমার ছেলেকে দেখবি ?

বলেই হাঁক ছাড়লো, এই সপ্তমী। তোর ছেলে কই ? কোথায় গেলিরে ? পাণ্ডা ?

অমনি অদৃশ্য থেকে একটি সাত-আট বছরের ছেলে, খালি গা, একটি খাকি হাফপ্যাণ্ট পরা, একটি দিশী আমের আঁটি চুষতে চুষতে কুঁয়োটা ঘুরে যুযুধানের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বললো, কী বইল্‌তেচো ?

ইস্কুলের পড়া করবি না ?

কইরবোনে। মাংস ভাত রাঁধতিচি মা। ভালো কইরে। মাংস ভাতটা খেয়ে নিয়ে তাপ্পর পড়তে বসবোনে।

বুঝেছি। মাংস-ভাতটা খাওয়ার পর তো মায়ের কোলে ঠ্যাংটি তুলে দিব্যি ঘুমোবে সেই চারটে অবধি। তারপর ডাংগুলি খেলবে।

ডাংগুলি কেনে ? আজ তো রোববার। আজ ফুইট্‌বল।

তাই খেলিস প্যাণ্ডা। ফুটবলের পেছনে লাথি মেরো বাপ। এখন যাও আমটা খেয়ে হাতটা ধুয়ে এসে আমাকে ধন্য করো।

তোর ছেলে ? অবাক হয়ে যুযুধান বললো।

ছেলে সপ্তমীর। সপ্তমীর বর মরেছে কলে কাটা পড়ে। ডায়মণ্ড

হারবার রোডে একটি টেকসটাইল মিলে কাজ করতো। গ্রাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সব মেরে দিয়েছে। কিছুই দেয়নি। সপ্তমীর চেহারা ছবি ভালো। ছেলেটাকে আমি অ্যাডাপট করেছি। এ পাড়ার "মাগো বাণাপাণি স্কুলে" ভর্তি করে দিয়েছি।

অ্যাডাপটই যখন করলি তখন কোনো ভালো ইংলিশ-মীডিয়ম স্কুলে দিলি না কেন?

কী জন্যে? বাঁদর বানাবার জন্যে? ইংরিজি গালাগালি, ইংরিজি গান, আর চুটিয়ে ইংরিজি বলতে পারবে বলে? আজকাল তো আবার হিন্দী-মিশ্রিত ইংরিজি চালু হয়েছে। তারপর সাবান, তেল, টি. ভি., টুথব্রাশের ফেরিওয়ালা হবে? ব্রিলিয়াণ্ট মার্কেটিংম্যান! প্রোডিগ্যাল ম্যানেজার! প্র্যাগম্যাটিক অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট! সব তো মাড়োয়ারী গুজরাটি, পাঞ্জাবী ব্যবসাদারদের চাকর হয়ে, বাপ-মাকে তাচ্ছিল্য করে ধরাকে সরা-জ্ঞান করবে! ও আমার অনেক দেখা আছে। প্যাণ্ডা যখন কলেজে পড়বে তখনও ওকে দিয়ে আমি পা টেপাবো রাত্তিরবেলা। দিশি কুকুরদের যেমন অ্যাডাপট করেছি, দিশি ছেলেই অ্যাডাপট করবো। দোআঁশলা ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

আর সপ্তমী?

তাকেও অ্যাডাপট্ করেছি।

যুযু অবাক হয়ে বললো, মেয়ে হিসেবে?

দূর শালা! তুইও যেমন। মেয়ে কেন, বৌ হিসেবে।

বৌ অ্যাডাপট?

হোয়াই নট? ছেলেমেয়ে তে আর হবে না। নিজের নাম আর পদবী তো পরের ছেলেমেয়েকে দান করেই দিয়েছি। নিজের নামটাই তো চুরি হয়ে গেছে। নিজের ছেলেমেয়ে হলে ঝামেলা। এই ভালো। উইলও করে ফেলেছি একটা। আমার এই বাড়ি এবং যতটুকু সঞ্চয় আছে তা সপ্তমী পাবে। তবে প্যাণ্ডাকে মানুষ করার

এবং কালু লালুকে কুকুর হিসেবে যতদিন বাঁচবে তাদের পূর্ণ সম্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ তাকেই করতে হবে।

তোর উইল এগজিক্যুট করবে কে ?

সে একজন হাইকোর্টের জজ এবং একজন নামী সলিসিটারকে এগ্‌জিক্যুটর করেছি। উইল ঠিকই একজিক্যুটেড হবে। জজ সাহেব আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

আমি যদি একটা উইল করে যাই তো তুই তার এগজিক্যুটর হবি ?

নিশ্চয়ই। কিন্তু দাগী চোর, চুরির দায়ে যার চাকরি যায়, তাকে কি তোর এগজিক্যুটর করা উচিত ?

সে আমি বুঝব।

আরেকজন ?

আরেকজন কাকে করি তাই ভাবছি।

তোদের পাড়ার মোড়ের মধুদার পান-বিড়ির দোকানটা এখনও আছে ?

তোর মনে আছে এখনও ? আশ্চর্য মেমারী তোর! সত্যি! আছে। তবে মধুদার এখন প্রায় ষাট বছর হতে চললো।

তো ঐ মধুদাকেই কর। তুই থাকতে থাকতে মধুদা পটল তুললে তখন ভেবে চিন্তে আরেকজনকে করিস। আমি পটল তুললেও আমার জায়গায় অন্য একজনকে করতে হবে।

চাল নেই চুলো নেই মধুদাকে করা কি ঠিক হবে ?

একদম ঠিক হবে। চাল-চুলোওয়ালাদের মধ্যে ভদ্রলোক আর নেই বললেই চলে। বেশির ভাগই চোর-ছ্যাঁচোড়।

তাই করবো তাহলে।

সপ্তমী যখন চা নিয়ে এলো তখন ভালো করে চেয়ে দেখলো যুযুধান। বুদ্ধিমতী, সুন্দর শরীরের গড়ন। তবে ঘোর লালরঙের শায়ার

উপরে ঘোর বেগুনে রঙের একটি তাঁতের শাড়ি। গায়ে একটি ছাইরঙা ব্লাউজ। রুচি-টুচির কোনো বালাই-ই নেই।

যুযুধানের চোখে তাকিয়ে সোম বললো, আমার বিয়ে করা বৌ-এর রুচি খুব ভালো ছিলো। কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রঙ যায় না যায় তা দারুণ জানতো। পার্ক স্ট্রীটের হেয়ার-ড্রেসারের কাছে গিয়ে পেডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসাল, হেয়ার-ডু সব করে আসতো। ইকেবানা জানতো। সাজসজ্জা ছিলো তার দেখার মতো। কিন্তু বাইরের সাজ নিয়ে, বাইরের চরিত্র নিয়ে তো ঘর করলাম! নিরাবরণ শরীর আর নিরাভরণ সরল সৎ মন যার আছে তাকে দিয়েই বাকি জীবন চলে যাবে আমার। আসল কাকে বলে আর মেকী কাকে বলে তা আমার মতো জানবি না তুই কক্ষণো।

স্তব্ধ বিস্ময়ে, মাথা নিচু করে বসে যুযুধান বললো, হবে।

হবে না রে। এইটেই সত্যি কথা।

আমি এবারে উঠবো সোম। চা খাওয়া হলো।

আরে দাঁড়া। দাঁড়া। পান খা দুটো। এক ছিলিম হুঁকো খেয়ে যা।

হুঁকো!

হ্যাঁরে। এমন নির্দোষ নেশা আর কি আছে। তোকে আলাদা হুঁকো দেবো।

প্যাঙা—আ—আ, বলে এক তীব্র ডাক ছাড়লো সোম।

আমি এইখানে।

একটি ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেলো ঊর্ধ্বাকাশ থেকে।

কোথায় গেছিস হতভাগা? মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

এই যে! আমড়া গাছে। আমড়া খেতিচি।

নেমে আয় এখুনি। হুঁকো সাজ আমাদের জন্যে। সপ্তমী, ভালো করে চারখিলি পান সাজ তো দেখি। আমার বন্ধুকে জর্দা দিস না।

যুযুধান বললো, প্যাঙাকে একটা ভালো স্কুলে দিলি না এইটে ভেবেই আমার দুঃখ হচ্ছে।

ভালো স্কুলে দিলে জন্ম-জ্যাঠা হয়ে যেতো, আমার পদবীর ছেলে মেয়েরা যেমন হয়েছে। প্যাঙার শৈশব আর কৈশোর তো থাকবে নিজস্ব। তাতো কেউ আর চুরি করে নিতে পারবে না। এই পুরো এডুকেশন সীসটেমটাকেই স্ক্র্যাপ্ করে দেওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সময় আছে কার বল ? একমাত্র চিন্তা তো গদির। পাঁচবছর বাদে বাদে কী করে গদিতে বসা যায়। এই চিন্তা সকলেরই। আর মধ্যের পাঁচটা বছর শুধু ভুজুং-ভাজুং। এমনি করেই পাঁচ ইনটু এইট চল্লিশ বছর কেটে গেলো। আমার পলিসিই ভালো, বুঝলি। প্যাঙাদের তবু কিছু নিজস্বতা থাকবে, মধুদাদের মতোন। (ইংলিশ-মীডিয়ামের ছেলেমেয়েগুলো যেন সব রোবোট। একরকম চেহারা, এক-রকম কথাবার্তা, একরকম উচ্চাশা, সব প্রোটোটাইপ, ওরিজিনালিটি বলে কোনো ব্যাপারই নেই) অমানুষ তৈরী করা হয় সেখানে মানুষের বাচ্চাদের ভর্তি করে। আসলে যে-কোনো এডুকেশানেরই একটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরাই জাতের ভবিষ্যৎ। তাদের নিয়ে যে কী ছিনিমিনি খেলা চলছে তা যদি তুই জানতিস। আমার পদবীর দুটি বাঁদর-বাঁদরীকে কাছ থেকে দেখে আমি জানি ভালো করেই। ইংলিশ-মীডিয়াম, এডুকেশন অফ লেটার্স দেয়, এডুকেশন অফ ক্যারেক-টার দেয় না।

যুযুধান চুপ করে রইলো। তারপর বললো, আমি উঠি।

আরে দাঁড়া। পানটা না হয় হাতে করে নিয়ে গিয়ে রাস্তায়ই খাস, হুঁকোতে তো দু'টান লাগিয়ে যা। তোর থ্রিলড্ লাগছে না ? এক-বিংশ শতাব্দীর চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার যে এই উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছনোর সাধনা। তাকে কি তুই খারাপ বলিস ?

না। তা নয়, তবে তুই যে ওরিজিনাল সে বিষয়ে কারোই কোনো

সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আচ্ছা, একটা কথা বল তো? তুই কি সত্যিই সুখী এই মুহূর্তে! না, তোর নানারকম দুঃখরই একটা বিকৃত রূপ তোর এই জীবন?

সোম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তার চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে এলো। তারপর ও বললো, খুবই দুঃখী ছিলাম। আগে ছিলাম। এখন সত্যিই সুখী। সুখ তোকে এ সংসারে চামচে করে কেউই খাইয়ে দেবে না যুযু। তোকে তা কেড়ে নিতে হবে। এবং একজনের সুখ মানেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, আরেকজনের দুঃখ। এটাকে বেশিরভাগ সময়েই অ্যাভয়েড করা যায় না। কিন্তু বাই এনি মীনস্, সুখকে যদি একবার চিনে নিতে পারিস, তবে সেই সুখকে তোর পাওয়া উচিত, নিজের কাছে টেনে নেওয়া উচিত। চিনে নিলে, তা কাছে টানা নিয়ে দ্বিধা না করাই ভালো।

প্যাঙা আমড়া গাছ থেকে নেমে এসে শোবার ঘরে গিয়ে একটু পর দুটো হুঁকো দু'হাতে ধরে নিয়ে এলো। বললো, ছিলিম্ তো সাজানোই ছেলো। জলও পাইল্টে দিচি সক্কালে।

সোম প্যাঙাকে বললো, আয় তো দেখি, মাথার পাকা চুল বাছ তো দেখি। একটার জন্যে এক নয়া করে পাবি।

মাইরী বইল্তেচো।

মাইরী বইল্তেচি। সোম বললো।

যুযু অবাক হয়ে সোমের দিকে চেয়ে রইলো। সোম ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে বাংলা এবং ইংরিজিতে লেটার পেয়েছিলো। তা ছাড়াও চারটে বিষয়ে লেটার পেয়েছিলো। পরবর্তী জীবনেও নিশ্চয়ই সেরকমই ভালো করেছিলো ফল।

সপ্তমী রেকাবীতে পান সেজে এনে দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে। মাথায় একটু ঘোমটা টানা।

নে। পান নে যুযু।

বলেই সপ্তমীকে বললো, তুই তো একটু হাসতেও পারতিস আমার বন্ধুকে দেখে। কই ? দেখা তো তোর গজদাঁতীটা এক বার !

তারপর যুযুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, না হাস্লি আবার তেনার গজদাঁতীটা দেখাই দিইতে চান না।

সপ্তমী কথার ধরনে হেসে ফেললো এবং সত্যিই ভারী মিষ্টি দেখালো হাসিটা গজদন্তর জন্যে।

যুযুধান হুঁকোতে দু'টান দিয়ে, একটু কেশে, পান দুটো হাতে নিয়ে সপ্তমীকে বললো, এবার যাই।

সপ্তমী আবারও গজদন্ত দেখিয়ে হেসে বললো, যাওয়া বইলতে নেই, আসুন। আবার আইসবেন। ওঁর কোনো বন্ধু নেই। এ বাড়িতে উনি কাউকে আনেননি আজ অবধি। দেড় বছর হয়ে গেলো। আপনিই একমাত্র মানুষ। আইসবেন। আমারও তো মাঝে মাঝে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে কারো সঙ্গে।

বইয়ের মতো বন্ধু নেই। বই পড়তে পারলে জানবি।

বলেই, যুযুধানকে বললো, ওকে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করিয়েছি। শিখছে কিন্তু খুবই ফাস্ট। সত্যজিৎ রায়ের বাংলা খুবই ঝরঝরে। তাঁর ফেলুদা কাহিনী দিয়ে শুরু করিয়েছি। ঠাকুরমার ঝুলি বা বুড়ো আংলা দিয়ে শুরু করার বয়স তো আর নেই।

যুযুধান হাসলো।

সোম বললো, জানিস তো সপ্তমী, আমার বন্ধু কিন্তু লেখে টেখে। যুযুধান রায়। তোকেও সই করে বই দেবে যদি তাড়াতাড়ি আরও একটু শিখতে পারিস।

সপ্তমী হাসলো। বললো, আপনার একটি গল্প পড়েছি আমি।

কোথায় ?

রীতিমতো সহর্ষে বললো যুযুধান।

একটি পুজো সংখ্যাতে। ভালো নেগেচে বেশ।

নেগেচে নয়, লেগেছে। প্যাঙাকেও একটু শেখা। ছ্যা! লোকে বলে কি?

নোকের ভয় কি আপনি করেন?

না। করি না। আর করি না যে সেটা তোরা সকলে জেনে গেছিস বলেই তো যা-নয়-তা করে বেড়াচ্ছিস।

চলিরে।

তোকে বাসরাস্তা অবধি তুলে দিই আমি।

না না।

এই যে কালু-লালু, টা! টা! করে দাও কাকাকে। এই প্যাঙা গেলি কই? হতচ্ছাড়া?

কোথা থেকে একটা আওয়াজ এলো, আমি যে পাইকানায়।

আরো আম খাও। বাঁদর ছোকরা। আম, আমড়া, হুঁকো সব এক সঙ্গে।

যুযুধান আর সপ্তমী একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সপ্তমী বললো, জুজু কারো নাম হয়? আমি তো নাম শুনেই ভয়ে মরি।

সোম বললো, আরে ইডিয়ট। ওর নাম জুজু নয়। যুযু। যুযুধান।

মানে কি?

সংসদের অভিধান কিনে দিয়েছি। মাংসটা ভালো করে দৈ দিয়ে মেখে প্যাঙাকে নিয়ে পড়তে বোস গিয়ে। মাংস আমিই রাঁধবো খুব জম্পেস্ করে। 'যুযুধান' মানে দেখে আমাকে বলে যাবি। বুঝেছিস।

এবারে সত্যিই চললাম রে।

ভৌ। ভৌ। ভুক ভুক করে ডাকলো লালু কালু।

সোম বললো, পরদিন তোকে আমার লাইব্রেরীটা দেখাবো। যবে আসবি দুদিন আগে একটা পোস্ট-কার্ড ফেলে দিস।

আচ্ছা।

ভাবতে ভাবতে যুযুধান বাস রাস্তার দিকে এগোলো। ক্রমশঃ পিছনে পড়ে যেতে লাগলো সোম-এর নিজস্ব জগত! আমড়া গাছ, কুঁয়োতলি, কালু-লালু, কাঁচা উঠোন, সোম-এর অ্যাডাপটেড বৌ আর অ্যাডাপটেড ছেলে, সপ্তমী আর প্যাণ্ডা। পাকা বাড়ি, টিভির গাঁক-গাঁক, গাড়ির হর্ন, বাসের ও মিনির আওয়াজ, হাজার হাজার লোকের গলার স্বর, মাথা-তোলা তিনতলা চারতলা বাড়ির আড়ালে ক্রমশই হারিয়ে যেতে লাগলো সোম-এর একেবারে ওরিজিনাল জগৎ। কলকাতায় যে সোমের প্রোটোটাইপ আর দ্বিতীয় নেই সে কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারে যুযুধান।

প্রায় বাস স্টপেজে চলে, এসেছে, হঠাৎ পেছনে একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ পেলো সোম। সেটা পাশে এসে আস্তে হয়ে গেলো।

অমল বললো, দাদা! তুমি এখানে?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো যুযুধান, সকালে যে ছেলেগুলি চায়ের দোকানের সামনে বসেছিলো তাদেরই একজন মোটর সাইকেলের পেছনে বসে আছে। অনেক বোঁচ্‌কা-বুঁচকি তার দু দিকেই।

যুযুধান বললো, এসেছিলাম। তুই কোথায় এসেছিলি?

এই যে। আমার বীজনেস-পার্টনার সিভাস্ সেন।

কী নাম?

সিভাস্। সিভাস্ রিগ্যাল হুইস্কী আছে না?

তার নামে।

কিসের বীজনেস তোর?

অর্ডার সাপ্লাই।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?

সে করবে।

আমাকে জানাসনি তো।

কি হবে? কামাই না থাকলে জানাতাম।

বাড়িতে খাবি না?

না। আজ শ্রীও আসবে। আমার পিটারক্যাট-এ খাবো। লাঞ্চ।

সেটা কোথায়?

ওমা! তাই জানো না? মিডলটন্ রোতে।

ও।

চলি। অমল বললো।

চলি দাদা। অমলের বন্ধুও বললো। সিভাস্।



॥ সাত ॥



শ্রীলা আর যুযুধান খেতে বসেছিলো। পচার মা খাবার দিচ্ছিলো। শ্রীলা বসবার আগে সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে বসেছিলো।

একটি বাসন্তী রঙা তাঁতের শাড়ি পরেছে শ্রীলা। মধ্যে কালো কালো বুটি। সঙ্গে একটি কালো ব্লাউজ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেমন হাতার ব্লাউজ পরতেন, স্লিভলেসও নয় আবার আধখানা হাতাও নয়, এইরকম ব্লাউজ পরেছে সে একটা।

কী হলো দাদা। আপনি আজ খাচ্ছেন না ?

কই ? না তো। খাচ্ছি তো।

মুড়িঘণ্টটা আমি রেঁধেছি। কেমন হয়েছে ?

ভালো। খুবই ভালো। আমি তো ভেবেছিলাম, পচার মা রেঁধেছে।

না। আমি।

বাঃ। খোকা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি আজ বাড়িতে আমার সঙ্গে খাচ্ছো যে। তোমাদের না আজ 'পিটার-ক্যাট' না কোথায় খাওয়ায় কথা ছিলো দুপুরে, তাই না ?

শ্রীলার দু'চোখের মণি স্থির হয়ে গেলো।

বললো, আপনি জানলেন কি করে ?

আজ তো অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

কোথায় ?

কুঁদঘাটে।

শ্রীলার চোখের মণি দুটো কেঁপে গেল।

কুঁদঘাটে ? কুঁদঘাটের কোথায় ?

সে শেষপ্রান্ত থেকেও অনেকই দূর। প্রায় পাড়াগাঁই বলতে পারো। কাঁচা রাস্তা। দুধারে কাঁচা নর্দমা। কিন্তু কী সবুজ ! কী সবুজ ! ভারী ভালো লাগলো। সেখানেই দেখা হলো অমলের সঙ্গে। মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলো, পেছনে ওর এক বন্ধু বসেছিলো অনেক মালপত্র নিয়ে। নাম বললো সিভাস্। পৃথিবী-বিখ্যাত মদের নামে নাম। শ্রীলা কিছু বলার আগেই যুযুধান বললো, অমল নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ? বললো, ব্যবসা করছে ? সিভাস্ সেই ব্যবসার পার্টনার। ওই তো বললো, তোমরা আজকে দুপুরে...

কথা তো সেইরকমই ছিলো। হয়তো অপেক্ষাও করছে। একটার সময় ওর এক বন্ধু, হয়তো আপনি যাকে দেখেছেন সেই, মোটর-সাইকেলে করে আমাকে নিতে এসেছিলো। পেছনে আরও একজন বসেছিলো, তার মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিলো এবং চোখদুটোও জবাফুলের মতো লাল। আমাকে দুজনের মধ্যে বসতে বলেছিলো, দাদা। আমার গা-ঘিনঘিন করছিলো, তবু আমি বসতাম, কিন্তু দেখি দোতলার বারান্দাতে অপরেশদার স্ত্রী, হেনাদি দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যান্য বারান্দাতেও ছিলো আরও কেউ কেউ। কেন জানি না, আমার ভালো লাগলো না। আমি বললাম, আমার শরীর ভালো না, আমি যাবো না।

ওর বন্ধু বললো, অমল কিন্তু খুব রেগে যাবে।

বললাম, কী করব ? তাছাড়া, দাদা বাড়ি ফেরেনি। দাদাকে না বলে যাইই বা কি করে ? সেটাও সত্যি কারণ ছিলো দাদা।

হুঁ। যুযুধান বললো।

ভাত দিই আর একটু ?

না। আর দিও না। অবেলায় একটা বিরাট ওমলেট খেয়ে পেট ভরে গেছে। সোম শুনলো না কিছুতেই।

কে?

সেই যে আমার সেই পাগলাটে বন্ধু এসেছিলো না সেদিন। মানে এক রবিবার সকালে। তারপর না খেয়েই চলে গেলো।

শ্রীলা বাঁ হাত দিয়ে জলের জাগ থেকে জল ঢালছিলো গ্লাসে। হঠাৎ চোখ পড়ে গেলো যুযুধানের শ্রীলার বাম বাহুতে। এক ঝলক দেখতে পেলো। তিনটি কালো তিল। আশ্চর্য! কোনোদিনও লক্ষ্য করেনি আগে। অবশ্য তিল খোঁজার জন্যে এমন চিল-চোখে চায়ওনি কখনও।

বুকটা ধক্ করে উঠলো। অশান্তি, ঝামেলা, খারাপ কথা, অপ্রিয় প্রসঙ্গকে বড় ভয় করে যুযুধান।

শ্রীলা বললো, আপনার সেই বন্ধু কি এখন কুঁদঘাটে থাকেন?

হ্যাঁ।

তোমরা কি কখনও কুঁদঘাটে থাকতে?

হ্যাঁ।

মাথা নীচু করে বললো শ্রীলা।

তোমার বিয়ের সময়ে তো তোমরা বাঁশদ্রোণীতে থাকতে।

হ্যাঁ। কুঁদঘাট থেকে বিয়ের দুবছর আগে চলে আসি। বাড়িওয়ালা খারাপ ব্যবহার করছিলেন। তারপর মাও মারা গেলেন। বাবা তো চিরদিনই শয্যাশায়ী। তাই···। বাবাও।

ও। তুমি খাচ্ছো না কেন শ্রীলা?

পেট ভরে গেছে দাদা। আপনার ভাই যদি এসে আমাকে মার-ধোর করে আপনি বাঁচাবেন কিন্তু।

মারধোর? অমল তোমাকে মারধোরও করে নাকি?

না। রোজ কি আর করে? যদি কোনো অন্যায় করি।

পচার মা ইচ্ছে করে আড়ালে চলে গেলো।

কই ? একই বাড়িতে থেকে আমি তো কখনও বুঝতে পারিনি।

বুঝতে আমি তো দিইনি কোনোদিন দাদা। যদি কখনও অসহ্য হয় তখন বালিশে মুখ দিয়ে কাঁদি। যাতে আপনি না শুনতে পান, যাতে পাড়া-প্রতিবেশী শুনতে না পান, যাতে আপনার সম্মানহানি না হয়।

আমার সম্মানের কথা ভেবে তোমার মুখ বুঁজে মার খাওয়াটা উচিত হয়নি শ্রীলা। আমার সম্মান এতো ঠুনকো নয়।

যুনীদিদির কথা ভেবেও চিৎকার করিনি দাদা। আমার বিয়ে হয়তো কোনোদিনও হতো॰ না। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছি, তাও বাংলা মীডিয়াম স্কুলে। যুনীদিদি যদি এ সম্বন্ধ না করে দিতেন তবে তো ঘর, বর, ছেলে কিছুই পেতাম না। আপনার মতো দেবতুল্য ভাসুরও পেতাম না।

শ্রীলার চোখ জলে ভরে এলো।

যুযুধান এরকম নাটকীয় ঘটনার বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বড় মুশকিলে পড়ে যায়, কিন্তু আজ সকালে সোমকে দেখে পৃথিবীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে গেছে। কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিই তার কাছে আর আশ্চর্যজনক বলে মনে হবে না হয়তো।

যুযুধান উঠে শ্রীলার মাথাতে তার বাঁ হাতের তালুটি ছোঁয়ালো। সারা শরীরে শিহরন খেলে গেলো। লজ্জিত হলো যুযুধান। তার নিজের জন্যে, তার ভাইয়ের জন্যেও।

মুখে বললো, তুমি খেয়ে উঠে বিশ্রাম করো। তোমার মাথার তালু তো খুব গরম। তালুতে ভালো করে তেল দিয়ে চান কোরো, গরম জলে, বিকেলে। ভবিষ্যতে, যে-ঘটনার কথা তুমি বললে, তা যাতে আর না ঘটে তা আমি দেখবো।

নিচে নেমে, নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে বড় অসহায়

বোধ করতে লাগলো যুযুধান। এই ভাইকে বশে রাখার মতো কোনো জোরই তার নেই। অমল কোনোদিনও তার শাসন মানেনি। মানলে আজ সে এতোখানি বাড়তে পারতো না।

আবার শ্রীলার বাম বাহুর তিনটি তিলও তাকে বড় বিচলিত করেছে। অন্যান্য যে সব চিহ্ন বলেছে সোম সনাক্তকরণের, তা দেখার উপায় এবং ইচ্ছাও যুযুধানের নেই। কিন্তু এ তো বড় গভীর সমস্যার কথা।

যুনী এতো বুদ্ধি রাখে, সে নিশ্চয়ই সব জেনেশুনে শ্রীলার সঙ্গে অমলের বিয়ে দেয়নি। সে চিরদিনই দিল্লীতে। তার নির্গুণ অর্থহীন মোটামুটি সুশ্রী কাজিন-এর সঙ্গে যুযুধান-এর নিগুণ চাকরিহীন ভাইয়ের সম্বন্ধ এনে সে কোনো অন্যায়ই করেনি। শ্রীলার অতীত ঠিক কী ধরনের ছিলো, তা জানতে পারে ও একমাত্র সোম-এর কাছ থেকেই। কিন্তু পাগলার কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যা তাই তো বোঝা মুশকিল।

বড়ই বিপদে পড়লো যুযুধান।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। তবুও অমল এলো না। যুযুধানও ছটফট করতে লাগলো। তারপর পচার মাকে বলে, শ্রীলার কাছে থাকতে বলে সে আবারও বেরিয়ে পড়লো কুঁদঘাটেরই দিকে। জীবনে যেখানে একবারও যায়নি সেইখানেই একই দিনে দুবার যেতে হচ্ছে। সোমও কি মনে করবে, কে জানে! ও বলেছিলো, এলে পোস্টকার্ড ফেলে আসতে। ওর যেমন স্বাধীন-চেতা জীবনযাত্রা তাতে সেও নিশ্চয় চায় না যখন তখন যে-কেউ গিয়ে তাকে বিরক্ত করুক।

বাস থেকে যখন নামলো তখন লোডশেডিং। দোকানপাটের ঝাঁপও যেন বন্ধ বলে মনে হলো। একটি অল্পবয়সী ছেলে একটি এক-তলা বাড়ির রক-এ বসেছিলো। সে বললো, অন্ধকারে ওদিকে যাবেন না দাদা। একটু আগেই পেটো ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে গেছে।

কারা করলো ?

সে জানবো কি করে ? আর জানলেও বলা বারণ। নিজের প্রাণের মায়া কার না আছে ?

ও।

প্রাণের মায়া তার নিজের আছে কি নেই সে কথা ভাবার মতো মানসিক অবস্থাও যুযুধানের ছিলো না। লোডশেডিং থাকলেও আকাশে চাঁদ ছিলো। বাস থেকে নামার একটু পরই চোখ অভ্যস্তও হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো যুযুধান।

কিছুটা যেতেই পথের পাশের অন্ধকার গলি থেকে কে যেন একজন বলে উঠলো, কে যায় ?

আমি।

আমি কে রে শালা ?

আমি যুযুধান রায়।

কি ধান ?

যুযুধান।

এমন ধানের নাম তো জন্মেও শুনিনি বাপ ! কোন্ দেশের মাল গো তুমি ? আমন, আউস, বোরো, গোঁড়, এমনকি আই-আর-এইট, তাইচুং অবধিও শুনেছি। জুজুটা কি প্রকার ধান একটু দেখে আয় তো গিয়ে পট্‌লা। ধনের আমার প্রাণের মায়া আছে কি নেই জেনে আয়।

যুযুধান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পট্‌লা নামক বেঁটে মোটা একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে এগিয়ে এলো। পেছন থেকে সেই নেপথ্য-কণ্ঠ বললো, খোচড় কিনা ভালো করে দেখিস। ডান হাতে পেটো নিয়ে বাঁহাতে পুরো বডি সার্চ কর। এদিক ওদিক হলেই ঝেড়ে দিবি।

পটলা আজ্ঞামতো কাজ করলো।

চেঁচিয়ে বললো, সঙ্গে যন্তর-টন্তর নেই।

ধরে নিয়ে আয় শালা আমার কাছে। চাঁদমুখে টর্চ ফেলে দেখি একবার।

পটলা যুযুধানের কলার বাঁহাতে শক্ত মুঠিতে ধরে বললো, চল্ শালা।

বড় অপমানিত লাগছিলো যুযুধানের। ইচ্ছে হচ্ছিলো এক ঘুঁষিতে পটলার কানের পাটি ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু যুযুধানের হাত যে কবিতাই লিখতে পারে শুধু। মারামারি গুণ্ডামি করা তো শেখেনি ছেলেবেলা থেকে। তাছাড়া একটা অশিক্ষিত গুণ্ডা ছোকরা তার কলার ধরে টেনে নিয়ে যাওয়াতে তার যা অপমানবোধ হচ্ছিলো তার চেয়ে অনেকই বেশি অপমান বোধ হয়েছিলো এ কথা জেনে যে অমল শ্রীলাকে নিয়মিত একতরফা পেটাই দেয়। মারা আর মারামারিতে তফাৎ আছে। চিরদিনই ছিলো। একটি অসহায় ছিপছিপে মেয়েকে, যুনীর বোনকে, প্রায়ই একতরফা মারে তার ভাই তারই মাথার উপরের দোতলাতে বসে এ কথা শোনার পর থেকে তার মাথার ঠিক নেই। অসহ্য না হলে শ্রীলা বলতোও না যুযুধানকে কখনও। পচার মাও কোনোদিন বলেনি। পচার মায়ের চোখ দেখে মনে হয়েছিলো শ্রীলার প্রতিই সব সহানুভূতি ওর। তার উপরে আরও অপমানিত হয়েছে শ্রীলার বাম বাহুতে আবিষ্কৃত তিনটি তিল।

সোমও এতো বছর পরে তার জীবনে এক অভিশাপেরই মতো উদিত হয়েছে। স্কুলের পরীক্ষার পর কোনো যোগাযোগই ছিলো না। হঠাৎ যে কোথা থেকে সেদিন উদয় হলো চৌরঙ্গীর মোড়ে। কেনই বা ওদের বাড়িতে এলো ! এলোই যদি বাড়িতে, তবে কেনই বা শ্রীলার সঙ্গে যুযুধান আলাপ করিয়ে দিতে গেলো ! এতোদিন যার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই সে তো সম্পূর্ণ অপরিচিতই !

পট্লা বললো, নিয়ে এসেছি গুরু। দেখে নাও টর্চ ফেলে।

কলার ছাড় পট্লা। সকলের সঙ্গে কি এক ব্যবহার করতে হয় ? তোদের আর কতো যে শেখাবো জানি না।

ছেলেটির গলার স্বর এবারে বেশ মার্জিত এবং শিক্ষিত বলে মনে হলো। ইচ্ছে করে বাইরে একটা অন্যরকম ব্যক্তিত্বর আলখাল্লা পরে থাকে।

ছেলেটি টর্চ ফেললো যুযুধানের মুখে। টর্চ জ্বেলেই নিবিয়ে দিলো।

বললো, কোথায় যাচ্ছেন ?

এইখানে সোম ব্যনার্জি থাকেন। আজ সকালেও তাঁর কাছে এসেছিলাম। আমার বন্ধু ছেলেবেলার।

এতো কথা বলার দরকার ছিলো না যুযুধানের। কিন্তু ইচ্ছে করেই বললো যাতে সোম সম্বন্ধে এরা কিছু জানে কিনা জেনে নেবার জন্যে। সোমও যে অন্য আরেক রহস্য নয়, শ্রীলারই মতো বা সিভাস্-এর মতো তা কী করে জানবে ও ?

গলির প্রায়ান্ধকারে বসা ছেলেটি বললো, ও। পাগলা ইনকাম-ট্যাক্স ! চলে যান। তবে সাবধানে যাবেন। যদি কেউ কিছু জিগেস করে তাহলে প্রথমেই এই কথা বলে দেবেন।

কি কথা ?

যে, আপনি সোম বাঁড়ুজ্যের কাছে যাচ্ছেন। আমাদের সোমদার কথা আগে বললেও আমরা হ্যারাস্ করতাম না।

যুযুধান বললো, সোমবাবু লোক কি রকম ?

ছেলেটি হেসে ফেললো। বললো, আপনার বন্ধু বলছেন অথচ আমাকে জিগেস করছেন লোক কি রকম ? লোক চমৎকার। খাঁটি লোক। এ যুগে এমন খাঁটি লোক পাওয়া যায় না। তবে ছিটেল। মাঝে মাঝে ছিট বাড়ে। চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকেই এরকম হয়েছে। অনেক কম্যুনিস্ট, সোসালিস্ট, কংগ্রেসী শিক্ষা-তড়পানো লোক দেখলাম দাদা, কিন্তু এমন খাঁটি লোক আর দেখলাম না। পড়াশুনাই বা কত্ত।

সোম-এর বাড়ির সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলো যুযুধান তখন ফিকে জ্যোৎস্নায় ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছিলো একটানা।

দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে যখন তখনই কারেন্ট এলো। কিন্তু সোম-এর বাড়িতে তো ইলেকট্রিসিটিই নেই। তাই এখানে কোনো তফাৎ বোঝা গেল না।

প্যাঙা এসে দরজা খুললো, সঙ্গে কালু ও লালু।

ভেতর থেকে সোম বললো, কে রে প্যাঙা ? সন্ধ্যের পর কে এলো ? না বলে কয়ে ?

প্যাঙা বললো, তোমার সি বন্ধু গো। সেই যে সকালে এয়ে ডাবল্ ডিমের আমলেট্ সাঁইটে গ্যাইলো।

চোপ্। শালা ! তোর বাবার ওমলেট ?

হ্যাঁ তো। বাবারই তো ! তুমি আমার বাপ না তো কে ?

প্যাঙাকে উপেক্ষা করে সোম বললো, কি রে যুযু ? এতো রাতে ?

ভারী বিপদে পড়ে এসেছি। একটু বাইরে আসবি ?

বাইরে ? দাঁড়া ! পাঞ্জাবিটা গলিয়ে আসি। মাংস খাবি নাকি ? তোর জন্যে সপ্তমী রেখে দিয়েছিলো কেন জানি না। তোকে খুব মনে ধরেছে। বলেছে, খুব ভদ্রলোক নাকি তুই। দেখিস তুই আমার অফিসের বন্ধুর মতো করিস না আবার। অনেক প্রবঞ্চনা সয়েছি, আর সইবে না।

যুযুধান সে কথার উত্তর না দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ভারী শান্তি এখানে। দু-একটি বাড়ির আলো জ্বলছে তাও এতোই কম পাওয়ারের যে হারিকেনের আলো বলে মনে হচ্ছে। চাঁদের আলোতে এই জায়গাটাকে কলকাতা শহরের অংশ বলে মনেই হচ্ছে না আদৌ।

সোম বাইরে বেরিয়ে এলো, বললো, প্যাঙা লালু-কালুকে সামলা। বাইরে না চলে যায়। আর তোর মাকে বলিস আমি কাকাকে বাস-রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে এই এলাম।

একটু এগিয়ে এসেই সোম বললো, বল্ এবারে, কি ব্যাপার ?

কোনোরকম ভণিতা না করেই যুযুধান বললো, তুই শ্রীলাকে চিনলি কী করে ?

কে শ্রীলা ?

আমার ছোট ভাই অমলের স্ত্রী।

কে সে ? কার কথা বলছিস তুই ?

কী বলছিস তুই এখন। আমাদের বাড়ি যখন গেছিলি। এক রবিবার সকালে, আমার ভাইয়ের স্ত্রীকে দেখে তুই বললি না, তার বাম বাহুতে তিনটি তিল আছে এবং···।

ও-ও-ও। তাই বল্। তুই মুনিয়ার কথা বলছিস ? ওর নাম ছিলো মুনিয়া আর ওর দিদির নাম ছিলো ঢুনিয়া। হ্যাঁ ওকে তো চিনতাম।

কি করে চিনলি ? মানে কীভাবে চিনলি ?

আরে আমি যখন আমার স্ত্রীর প্রবঞ্চনার কথাটা জানি তখন কিছু-দিনের জন্যে আমি আমার স্ত্রীর উপরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে অনেক কিছুই করেছিলাম। প্রতিশোধ যে নিজেকে নষ্ট করে নেওয়া যায় না, নিজেকে গড়েই নিতে হয় সেই সত্যটা তখনও জানিনি তো, তাই। তখনই ওদের চিনি। একজন নিয়ে গেছিলো আমাকে প্রথমবার। তারপর থেকে মাস পাঁচ-ছয় যেতাম সপ্তাহে একবার করে। শুধু মুনিয়ার কাছেই। ঢুনিয়ার সঙ্গে আমি একবারও শুইনি। ভারী নম্র, সভ্য মেয়ে ছিলো।

তুই বলছিস কি ? শ্রীলা প্রস্টিট্যুট ছিলো।

কে শ্রীলা ? আমি মুনিয়ার কথা বলছি। হ্যাঁ। ছিলো। প্রাইভেট।

তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস ? সে আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

তুই তো শালা আচ্ছা মানুষ রে যুযু। মা শয্যাশায়ী, বাবা পঙ্গু, এক পয়সা রোজগার নেই। দয়া করলে, সে দাদার বন্ধু, দিদির নন্দাই, বা দেওরেরা সকলেই তাদের কাছ থেকে কিছু ট্যাক্সো বদলে নিয়েই দয়া

করতো। তাই ওরা দু'বোন বাধ্য হয়েছিলো। এবং যতটুকু টাকা না হলেই চলে না সেটুকুর জন্যেই করতো। বাজারের মেয়ে ছিলো না।

'একটু চুপ করে থেকে সোম বললো, একটা মানুষের প্রাণ তার ইজ্জতের চেয়ে অনেকই দামী রে যুযু! তুই কী করে জানবি? ভবানী-পুরে নিজেদের বাড়িতে থাকিস। শিশুকাল থেকে অভাব কাকে বলে তো জানিসনি। আমি জেনেছি। আমি বুঝি।

তা বলে প্রস্টিট্যুশান্।

গুলি মার শালা! গুলি মার! কোন্ শালা প্রস্টিট্যুশান করে না রে। তুই করিস না? আমি করিনি? শিক্ষক, নেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক কে প্রস্টিট্যুট নয় আজকে? ও মেয়ে দুটো নিজেদের আর মা-বাবাকে কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যা করার করেছিলো। যেই অবলম্বন পেয়েছে অমনি ছেড়ে দিয়েছে। আর আমরা কি সহজে ছাড়ি? প্রোমোশান পাবার জন্যে, অর্ডার সাপ্লাইয়ে অর্ডার পাওয়ার জন্যে, প্রফেশানে ভালো করার জন্যে, সে প্রফেশান যাই হোক না কেন, প্রতিমুহূর্তে নিজেদের আমরা বিক্রী করে দিই না? ওরা তো ছেড়ে দিয়েছে একটি মাত্র সুযোগ পেয়েই, আর যাদের দেখিস, তারা কি পারে? ন্যাকামি করিস না শালা। ওরকম মেয়ে পেয়েছিস ভাদ্রবৌ হিসেবে তোর ভাই বর্তে গেছে। তুই যদি ওদের এই কথা জানার পরেও তোর ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতিস তবে আমি তোকে আরও ভালো বলতাম। বুঝি না, এটা কী একটা ব্যাপার যার জন্যে তোর রাতের বেলা আমার কাছে ছুটে আসতে হলো?

তুই অনেক লেখাপড়া শিখে থাকতে পারিস যুযু, তোর শিক্ষার রকমটা যেমন দেখছি, তাতে তোকে শিক্ষিত বলতে পারছি না। উদার হ। উদার হ। জীবনের প্রত্যেক ঘটনাকেই প্রপার পারস্পেকটিভে বিচার করতে হয়। দোষ তো আমারই। মাথার গোলমাল যখন হয়,

তখন কখন যে কী করে বসি। ছিঃ ছিঃ আমি তোকে ঐ কথা বলেছি তোর বাড়িতেই বসে। ছিঃ অন্যায় তো তাহলে আমিই করেছি।

আজ শ্রীলাকে তোর কথা বলেছিলাম। চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেলো। আমার আরও অনেক সমস্যা। ভাইটাকে দেখলাম তোদের এই পাড়ায় সকালে। হয় চোরাই মালের কোনো ব্যবসা ফেঁদেছে নয় স্মাগ্‌লিং-এর। হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তারপর শ্রীলাকে নাকি মারে প্রায়ই।

খুবই খারাপ কথা! তবে তোকে আমি বলছি, আমি তোর এবং মুনিয়ার যে ক্ষতি করেছি, যে শান্তিভঙ্গ করেছি, তা আমিই পূরণ করে দেবো। তোর বাড়ি শীগগিরই একদিন গিয়ে আমি এমন ব্যবহার করবো মুনিয়ার সঙ্গে, তোরই সামনে যে, আমি পাগল বলেই যে ওকে চিনি বলে তোকে বলেছি এ কথা ও বিশ্বাস করবে। ও বিশ্বাস করবে, যদি তুই দেখাস যে তুই বিশ্বাস করেছিস। এটা আমার অপরাধ লাঘবের জন্যে তুই দয়া করে করিস রে যুযু। ঈস্‌স, বেচারী মুনিয়া। কত কষ্ট পেয়ে এসে একটি আশ্রয় পেলো তাও আমি ভাঙতে বসেছি। শালা নিজের পেছনে নিজের লাথি মারতে ইচ্ছে করে।

তাহলে আসবি একদিন।

নিশ্চয়ই। যত তাড়াতাড়ি পারি যাবো।

আসিস কিন্তু। একটা মেয়ের, তার সন্তানের জীবন তোর ওপর নির্ভর করছে। একটি রেসপেকটেবল্ পরিবারের রেসপেকট্।

হাঃ। হাঃ। হাঃ করে হেসে উঠলো সোম।

বললো, জোক অফ দ্যা ইয়ার! রেসপেক্‌টেবল্ মাই ফুট! রেসপেক্‌টেবল্ লোক কি দেশে এখনও আছে নাকি? ওসব গুমোর ছাড়! বল রেসপেক্‌টিবিলিটির ভেক আছে। তোর। আমার। সকলের। ওসব কথা ছাড়। ওসব কথা শুনলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। মাই ওয়াইফ ইজ আ মাচ বিগার হোর দ্যান মুনিয়া। মাই ফ্রেণ্ড মাই

কলিগ্ ইজ আ স্কাউণ্ড্রেল। আ ভিবচ্। অ্যাণ্ড দে আর রেসপেক্টেবল্। মুনিয়ার রেসপেক্ট নেই, আমার সপ্তমীর রেসপেক্ট নেই। থুথু ছিটোই আমি তোদের, সকলের, এই ফালতু রেসপেক্টিবিলিটির মুখে।

সোম-এর গলা উত্তরোত্তর চড়ে যাচ্ছিলো।

যুযুধান বললো, আস্তে। আস্তে। এই সোম।

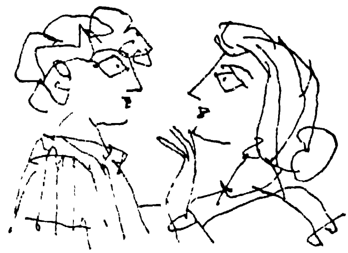
আস্তে কেন রে? এও তো তোদের ভণ্ডামি! শালা ঘোমটার তলায় খেমটা নেচেই দিন গেলো তোদের। একটা সত্যকে স্বীকার করতে পারিস না, চড়ের মতো চট্টাস শব্দ করে একটা সত্যকে ছুঁড়ে মারতে পারিস না অন্য লোকের মুখে, কীসের মানুষ রে শালা তুই! গুলি মারি তোদের।

থাম। থাম। সোম থাম। আমি এবারে চলে যাই। একাই যাবো।

দাঁড়া। পান খা একটা। সপ্তমীর সেজে দেওয়া পান। শী ইজ এইটীন ক্যারেট গোল্ড। সো ইজ মুনিয়া। উ্য মাস্ট গিভ হার ওল্ দ্যা প্রোটেকশান্ শী নীডস। নইলে জানবো, তুই শালা পুরুষমানুষ নোস। আই উইল প্লে মাই পার্ট ওল্ রাইট্। আই অ্যাম সরি যুযু। আমার এই পাগলামি। আমাকে ক্ষমা করেছিস তো? বল্ তুই! দিস সাম-টাইমস ফেইলস্ মী। তুই বুঝবি না। এর চেয়ে উন্মাদ হয়ে যাওয়া অনেক ভালো ছিলো, এই ল্যুনাসী, উইথ লুসিড ইনটারভ্যালস্, এইটে অসহ্য।

কী যে বলিস। কী যে বলিস তুই। বলতে বলতে, যুযুর চোখ ভিজে এলো। এই পৃথিবীতে যে সোম-এর মতো মানুষ এখনও দেখা যায় এই তো মস্ত বড় আশ্চর্যর কথা।

॥ আট ॥



কলকাতা

যুনী কল্যাণীয়াসু,

শান্তিনিকেতনে গেছিলাম গতকাল শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে। প্রণবেশের সঙ্গে। ওখানে ইন্দ্রনাথবাবুর বইয়ের দোকান (সুবর্ণরেখা) আছে। একেবারে রেলের টিকিট ঘরের পাশে। রতন পল্লীতে। উনি স্থানীয় লোক এবং প্রতিপত্তিসম্পন্ন। অনেককেই জানেন শোনেন। তাঁর দোকানে আমার বই দেখে পুলকিত হলাম। কিরীটি রায় বলে শ্রীনিকেতনের একজন ঠিকাদারও অনেক সাহায্য করলেন। ওঁর গাড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক জমি দেখালেন। ভারী ভদ্রলোক। ওখানের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়িও তিনি বানিয়েছেন। তাছাড় ভগত ভাই-এর দুই ভাই, হরি মাড়োয়ারীর ছেলে নন্দলাল আগরওয়ালা এঁরাও খুব সাহায্য করলেন।

প্রণবেশের ব্যাপারই আলাদা। ও নিমাইসাধন বসু, ভি. সি. কেও চেনে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনে। সীমেন্স-এর (এখন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ডিরেক্টর) পি. সি. গুহ সাহেব, সি ই এস সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি. বি. ঘোষ সাহেব, দিলীপ সেন, সুশীল বোস ইত্যাদি বহু মানুষকেই চেনে। তবে এতো চেনা-জানা আমার মতো সামান্য মানুষের তো কোনো কাজে আসার নয়। বরং বেশি চেনা-শোনাও গাজন-নষ্ট হয়। যার সামর্থ্য সামান্য এবং সাধ অসীম তার পক্ষে নিজের এমন সব বিখ্যাত পদমর্যাদাসম্পন্ন মানুষদের সংস্পর্শে আসাটাও অস্বস্তিকর।

যে কটি জায়গা দেখলাম, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগলো একটি। কয়েকটি সোনঝুরি গাছ আছে। দূরে ক্যানালটি দেখা যায়। কোপাই নদী পেরিয়ে যে বর্ধমানের দিকে বাইপাস চলে গেছে সেই পথটিও। দাম তিন হাজার করে কাঠা। আমি দশ কাঠার কথা বলে এসেছি এবং এক হাজার টাকা বায়না-বাবদ দিয়েও এসেছি। ওখানকার উকীল এবং সারভেয়র লতফুল কবীর সাহেবকে সব দায়িত্ব দিয়ে এসেছি। তুমি এলে রেজিস্ট্রী করবো। তুমি নিজে না-দেখে 'হ্যাঁ' না বললে, নেবো না। বায়নার টাকা না হয় মারই যাবে।

টাকা তোমার পাঠাতে হবে না। তোমাকে ছোট্ট একটি বাড়ি ওখানে আমি করে দিতে পারবো। তুমি তোমার বাপ্পুকে বোলে প্ল্যান করাতে পারো। এখানেই শুনলাম যে বাপ্পু নাকি প্রীতিরঞ্জন রায়ের ছেলে। উনি ইণ্ডিয়ান অক্সিজেনের ডিরেক্টর? এও শুনলাম যে বাপ্পু নাকি সস্ত্রীক স্টেটস্-এ চলে গেছে। যদি তাই হয় তো জানিও।

প্রণবেশের জানাশোনা একজন ভালো আর্কিটেক্ট আছেন এখানে। নাম মিহির মিত্র। ব্যালার্ডি থমসন ম্যাথুজের প্রিয়ব্রত সরকারকেও বলতে পারি। উনি আমার লেখার খুবই ভক্ত। চমৎকার, অভিমান-শূন্য মানুষ। ভালো ছবিও আঁকেন। আমাকে আন্তরিকভাবে ভালো-বাসেন। সম্পূর্ণ স্বার্থহীন এ ভালোবাসা, তাই তাঁর কাছে কিছু দাবি করা চলে। মানুষও খুব ভালো।

আজকাল ভালো কথা বলার মতো মানুষ সংসারে এতোই কমে যাচ্ছে যে কারো সম্বন্ধে ভালো কিছু বলতে পারলে বড়ই প্রসন্ন বোধ করি। অন্যকে ভালো বলতে বলতে মানুষ নিজেকেও বোধহয় ভালো করে তুলতে পারে।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস সকালে ছাড়ে। নটা পঞ্চাশে। পৌঁছে যায় সাড়ে বারোটা নাগাদ। বর্ধমানে থামে শুধু পথে। যদি ভোরবেলা যেতে চাও তো কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আছে। ছটা নাগাদ ছেড়ে প্রথম

স্টপেজই শান্তিনিকেতনে। দু'ঘণ্টা লাগে। কাঞ্চনজঙ্ঘা রবিবারে নেই। এই দুটি গাড়িই হয়েছে গণিখান চৌধুরীর আমলে। নিমাইসাধন বসুরও অবদান নিশ্চয়ই আছে। এই অধ্যাপক তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদে শান্তিনিকেতনের জন্যে অনেক কিছুই করে গেলেন সে কথা স্বীকার অবশ্যই করতে হবে। এই ট্রেন দুটি হবার পর থেকেই কলকাতার দম-বন্ধ মানুষদের শান্তিনিকেতনের দিকে চোখ পড়েছে। এতো কাছে অথচ লাল মাটি, খোয়াই, তীব্র শীত-গ্রীষ্ম। অতি মনোরমা বর্ষা। শান্তিনিকেতনের বর্ষার নাকি কোনো তুলনা নেই। জল জমে না। হিম হিম ভাব। খিচুড়ি খাও'আর কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাও!

তবে সেখানে যাঁরাই বাড়ি করেছেন বা করছেন তাঁরা সকলেই যদি গাছ লাগানোকে ব্রত হিসেবে না নেন (ফুলের বাগান নয়, বড় গাছ), তবে শান্তিনিকেতনও কলকাতা হয়ে উঠবে আর কিছুদিনের মধ্যে। দোতলা তেতলা বাড়ির ধুম্ পড়ে গেছে। দেখে খারাপ লাগলো। এই ধুম্-এর প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেলো শঙ্খদার নতুন কবিতার বই প্রকাশ করেছে প্রমা, 'ধুম্ লেগেছে হৃৎকমলে'। এবং আরও মনে পড়ে গেলো যে শঙ্খ ঘোষ শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র ভবন'-এর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এমন সুস্থ ও যোগ্য নির্বাচন এই অযোগ্যতা আর দলাদলির প্রদেশে খুব বেশি দেখা যায় না। এর পরের বার শঙ্খদার সঙ্গে দেখা করে আসবো। মেয়েরা ভালোবেসে না করলে বাড়ি-টাড়ি হয়ও না; করা উচিতও নয়। আমার তাই মনে হয়। জমি, বাড়ি, ফুল, পাখি ও নারী সকলেই সমগোত্রীয়। তুমিও যদি তেমন উৎসাহ না পাও, তাহলে কি হবে? আমি টাকা দিতে পারি কিন্তু তা ছাড়া আমার আর যে কোনোই যোগ্যতা নেই। আমি যে পুরোপুরিই অপদার্থ খুনী। তাকি তুমি এতোদিনেও বোঝোনি? হয়তো বুঝেছো বলেই ভালোবাসো এতো। মেয়েরা বোধহয় স্ব-নির্ভর পুরুষমানুষকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। আমার মনে হয়। কথাটা কি ঠিক?

শান্তিনিকেতনে এখনও অনেক পাখি আছে। সাইকেল রিকশার হর্ন ছাড়া এখনও নয়েজ-পল্যুশান বিশেষ নেই। কোনো তরুণ গলা তুলে তরুণীকে ডাকলে পাখির ডাকের সঙ্গে মেশা শুধুমাত্র তার গলাই কোনো পাখিরই ডাকের মতো আলাদা করে কানে আসে হাওয়ার মর্মরের সঙ্গে। এও এক বিস্ময়! বড় শান্তির জায়গা এই শান্তিনিকেতন। নামটি সার্থক। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম কী অনর্থক হতে পারে!

তুমি কবে আসছো? এবারে এলে তোমার সঙ্গে আমার স্কুলের এক সহপাঠীর আলাপ করিয়ে দেবো। সে এই কলকাতারই বুকে তার শান্তিনিকেতন গড়ে নিয়ে চমৎকার বেঁচে আছে। সে এতোই ওরিজিনাল, তার ব্যক্তিত্বর এতোই ঔজ্জ্বল্য, সে এতোই বিপরীতমুখী তার চরিত্রে ও ব্যবহারে, যে তাকে দেখার আগে মনে মনে মানসিক-ভাবে প্রস্তুত হয়ে এসো। নইলে চোখ ঝল্‌সে যাবে এবং ওকে বুঝতে না পেরে ভুল বুঝবে। অনেক দুর্নাম মাথায় নিয়ে, অনেক বঞ্চনা সয়ে তবে সে মানুষের জীবনের এক গন্তব্য আবিষ্কার করেছে। জীবনের মানে পেয়েছে। তার মত ও পথ তুমি না মানলেও মানতে পারো, কিন্তু সাহস ও ওরিজিনালিটিকে না মেনে কারও উপায় নেই।

অমলকে নিয়ে সমস্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সে সব কথা চিঠিতে বিস্তারিত লিখছি না। শ্রীলা ছেলেমানুষ। তার সঙ্গে অমলের ব্যবহার ক্রমাগত খারাপই হয়ে চলেছে। তুমি কি এসে আমার এই সংসারের ভার নিতে পারো না হাতে?

প্রণবেশকে বলেছি তোমার জন্যে যে করেই হোক পশ্চিমবঙ্গে এবং কলকাতার একশো মাইলের মধ্যে যেখানে হয় একটি লেকচারারশিপ যোগাড় করে দিতে। শান্তিনিকেতনে হলে তো কথাই নেই। হয় তুমি আসবে সপ্তাহান্তে, নয় আমি যাবো। তোমার গাছ-গাছালি-ঘেরা পর্ণ-কুটিরে থাকবো। তোমার সঙ্গে এক খাটে শোবো।

ভাবতেই গায়ে শিহরন লাগছে।

ভালো থেকো

— ইতি তোমার যুযুদা

পুনশ্চ / গতকাল টেলিফোন ঠিক হলো। 'ইলা বসু' বলে যিনি পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি মিথ্যা নাম বলেছিলেন। প্রেম করার জন্যে তো আমি নাম জিগেস করিনি জেনারাল ম্যানেজারের পি. এ.-র! যাতে কমপ্লেন যে করলাম এবং কার কাছে করলাম তা ভবিষ্যতে রেফার করতে পারি এই জন্যেই জিগেস করেছিলাম। জি এম হীরালাল মুখার্জি ও ইলা বসুকে সই করে বইও পাঠিয়েছিলাম অগ্রিম কৃতজ্ঞতা হিসেবে। মুখার্জি সাহেব বই গ্রহণ করে লেখক যুযুধান রায়কে সত্যিই খুশি করেছেন। কিন্তু অস্তিত্বহীন ইলা বসুর বইটি ফেরৎ এসেছে। জানি না, কী ধরনের শিক্ষা এবং রসিকতা এবং দায়িত্বজ্ঞান থেকে এই ধরনের অকারণের অপমান ঘটানো যেতে পারে। 'ইলা বোস'-এর এই অহেতুক তঞ্চকতা ভবিষ্যতে কাউকে কোনো বই দেওয়ার আগে আমাকে বহুবারই ভাবতে বাধ্য করবে। বিদেশে প্রত্যেক সরকারী চাকুরে তাঁদের আইডেনটিটি জানাতে বাধ্য। সেখানে তাঁরা জনতার সেবক। এখানে জনতাই তাঁদের সেবক। এই তফাৎ। না চাইলে কাউকেই বই পাঠানো বোধহয় নিজেকে অপমান করার একটি সহজ পথই তৈরী করা। তা আর করবো না। এই লজ্জাকর ব্যাপারটাতে বড়ই মর্মাহত হয়েছি। সারল্য এই সংসারে মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

টেলিফোন শেষকালে ঠিক হলো যাঁর দয়াতে (মুমু´ সাহেবের অফিসের একজন) সেই মহিলা নিজেই একটি বই চেয়েছেন আমার সই করা। আমার লোকের মাধ্যমে। নাম বলেননি। বই পাঠিয়ে দিয়েছি সই করে। মানে হচ্ছে, প্রকৃত 'ইলা বোস' মহিলা মানে, ইলা

বোসের আড়ালে থেকে অভব্যতাটা যিনি করেছিলেন তিনি পুরো টেলিফোন ভবনেই যে কত চালাক এবং লেখক যুযুধান রায় যে কত-খানি বোকা এই কথাটা বলে সকলকেই "অনামা" থাকতে বলেছেন। জেনারাল ম্যানেজারের অফিসে তো হেঁজিপেঁজি মেয়ে বসে ফোন ধরেন না। তিনিও বিলক্ষণ ক্ষমতাবান। এবং এই দেশে যার হাতে যেটুকু ক্ষমতা, সেইটুকুই অপব্যবহার বা পুরোপুরিই অব্যবহার করা-টারই আরেক নাম তো "বড় চাকরি" করা।

ভালো থেকো যুনী। চিঠি দিও। আম্নু আর যবন কেমন আছে?

ইতি তোমার যুযুদা।

চিঠি লেখা শেষ করে কলম নামিয়ে রাখলো টেবলে যুযুধান।

যুনীর কলমটা আজও পাওয়া গেল না।

পচার মা এসে বললো, দাদা ফোনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো।

সে কী!

হ্যাঁ! বৌদি এসে বলবে কী হয়েছে।

বাইরে থেকে শ্রীলা বললো, দাদা, আসবো?

এসো।

এক্ষুণি এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেম। বললেন টেলিফোন ভবন থেকে। বললেন, যুযুধানবাবুকে বলবেন যে আমার নাম ইলা বোস। আমি দেখবো যাতে ওঁর ফোন কখনওই ভালো না থাকে। উনি জি. এম.-এর অফিসে কমপ্লেন করেছেন কেন?

আমি বললাম, আমি তো কিছুই জানি না। আপনি কী যে বলছেন তাও বুঝতে পারছি না।

আপনি কি যুযুধানবাবুর স্ত্রী বলছেন?

আমি বললাম, না। আমি ওঁর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

ওঁর স্ত্রীকে একটু দিতে পারেন।

বললাম, ওঁর তো স্ত্রী নেই।

গত হয়েছেন?

না, না। উনি তো ব্যাচেলর! আমি বললাম।

ও ব্যাচেলর! বুঝেছি!

বলেই কী যে বুঝেছেন তা না বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলেন। এবং ছেড়ে দেওয়ার পরই ডায়াল টোন চলে গেলো।

এখন কি করবেন দাদা? দু মাস তিন দিন পরে ঠিক হলো ফোন!

যুযুধান হাসলো শ্রীলার উত্তেজনা এবং কথা বলার ধরন দেখে।

করবো আর কি? বেশি যা করতে পারি…

চিঠি লিখবেন? খবরের কাগজের সম্পাদককে?

দুস্‌স্‌, তাতে কি হবে? রোজ কতো চিঠি বেরেচ্ছে। পিঠ করেছি কুলো আর কানে ভরেছি তুলো। লজ্জাবোধ ব্যাপারটা, আত্মসম্মান ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরিই! যা করতে পারি তা হচ্ছে কোথাও লিখে দেওয়া। কোনো ম্যাগাজিনে, কোনো গল্পের মধ্যে এই সত্য ঘটনা ঢুকিয়ে দেওয়া।

ওরা যদি কেস করে?

কেস ওঁরা কি করবেন। কেস করলে টেলিফোন যারা পয়সা দিয়ে রাখে অথচ ফোন কাজ করে না তারাই করতে পারি। কিন্তু করলে ইলা বোসেরই বা কি আর জি. এম.-এরই বা কী! ওঁদের পকেট থেকে তো আর কেস লড়ার খরচা দিতে হবে না। আর জেলেও যেতে হবে না। সরকারের টাকা হলো গৌরী সেনের টাকা! যত্তরকম ট্যাক্স আছে তা কেন্দ্রীয় সরকারই বলো আর রাজ্য সরকারই বলো কান ধরে আদায় করতে খুবই দড়। কিন্তু সিভিক স্টেটে যে জনগণেরও কিছু পাওয়ার ছিলো ন্যায্য মূল্যের বদলে তা কে জ্ঞান বলো? রেশনের চালে কাঁকর, চাল বাড়ন্ত, হাসপাতালে নবজাত শিশুকে কুকুরে মুখে তুলে নিয়ে যায়, লোডশেডিং, টেলিফোন চলে না, চিঠি আসা-যাওয়া

করে না সময় মতো, বাসে-ট্রামে চড়া যায় না, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস অগ্নিমূল্য, লেখাপড়ার এই অবস্থা! কত হাজার পরীক্ষার্থীর ফল যেন ইনকমপ্লিট? এক ছাত্রী তো আত্মহত্যাই করলো ফল না বেরোনোতে। তার মা-বাবা যে কেস করেছেন খুব খুশি হয়েছি।

আমরা সবই সহ্য করে করে এদের সকলেরই, সব স্তরের সরকারী আমলাদেরই সাহস এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি যে এঁরা অসহ্যই হয়ে উঠেছেন। আমিও সরকারী কর্মচারী। তোমাকে বলছি শ্রীলা, আবারও নকশাল আন্দোলনের মতো কোনো আন্দোলনের সময় হয়েছে। ব্যবসাদার আর কিছু সরকারী চাকুরেদের প্রাণে মেরে দেওয়ার সময় এসে গেছে। মারকে এরা যমের মতো ভয় পায়। "টেররিজম খারাপ" "টেররিজম খারাপ" সবসময়ে চিৎকার শুনি, অথচ দ্যাখো যারাই টেরর ক্রিয়েট করছে সন্ত্রাসবাদের পথে যাচ্ছে, তাদের সব দাবিই সুড়সুড় করে মেনে নেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিং দ্যাখো, পাঞ্জাব দ্যাখো, আসাম দ্যাখো। টেররিজমই যদি একমাত্র পথ হয় তবে যে বাঙালীরা একদিন পুরো দেশকে টেররিজম্ শিখিয়েছিলো ব্রিটিশ আমলে, সেই টেররিজমই ফিরিয়ে আনতে হবে। এই বাঙালী জাতের ঘুম ভাঙাতেও চবুকের দরকার। শক্-থেরাপীর। নইলে কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না।

দাদা, বলছেন বটে! কিন্তু দেশের দশের কথা ভেবে এসব করবেটা কে, আপনার ভাইয়েরা?

না। অমলরা নয় তা আমি জানি। কিন্তু দেশ নিয়ে ভাবে এমন ছেলেরও অভাব নেই। নকশাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সব-চেয়ে মেধাবী ছেলেরাই আগে। আন্দোলনের মাথা তারাই। তবে সেই আন্দোলন ভুল পথে চালিত হয়েছিলো, ভুল লোকদের মারা হয়েছিলো সেবারে। আন্দোলন বানচাল করার জন্যে গুণ্ডা বদমাশ খুনীদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে। সেই জমানাতে যেভাবে গুলি করে সব তাজা ছেলেদের বিনা বিচারে এমনকি বিচারের

প্রহসন ছাড়াই মারা হয়েছিলো তা চিরদিন মানুষ মনে করে রাখবে।

সাক্ষী পাওয়া যেতো না বলেই তো বিচার করে শাস্তি দেওয়া যেতো না। তাই তো অমন করে মারা ছাড়া উপায় ছিলো না।

শ্রীলা বললো।

কেন পাওয়া যেতো না? রবিবারের দিন দুপুরে সরু গলির মধ্যে পাঁচ-ছজন ছেলে মিলে যদি একজন মানুষকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারে আর সে-মানুষটা ক্রমাগত বাঁচাও! বাঁচাও! বলে চিৎকার করতে থাকে, আর তখন গলি বা পাড়ার সব মানুষ ঝপাঝপ জানালার কপাট বন্ধ করে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন এবং মানুষটা মরে যাবার পরে পুলিশ এলে "আমরা কেউ কিছু দেখিনি বা শুনিনি" বলেন তাহলে সাক্ষী দেবেটা কে? যদি আমাদের এতোটুকু সাহস বা সততাও না থাকে তবে তো আমাদের মরাই উচিত। এই বেঁচে থাকা কি বেঁচে থাকা? প্রতিপদে দয়া ভিক্ষা করে? বাসের পাদনীতে একটু পা রাখার জন্যে, সময়মতো রেশন পাওয়ার জন্যে, অসুখ হলে সাধারণ চিকিৎসার জন্যে, ছেলে-মেয়েকে ন্যূনতম লেখাপড়া শেখাবার জন্যে, টেলিফোন সচল রাখার জন্যে, ডাকে ফেলা চিঠির গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্যে, যেখানে ইলেকট্রিক বিল কুড়ি টাকা হওয়ার কথা সেখানে তিনশো টাকা বিল দয়া করে না-পাঠানোর জন্যে, এই যে লাগাতার দয়া ভিক্ষা এ পৃথিবীর কোনো গণতন্ত্রে চিন্তা পর্যন্ত করা যায় না। যেমন আমরা তেমনই আমাদের নেতারা, আমলারা আর তেমনই আমাদের প্রাপ্তি শ্রীলা। টেররিজম্। টেররিজম্ ইজ দ্য ওনলি ওয়ে আউট্। অনেক সময় বয়ে গেছে। এনাফ্ ইজ এনাফ্।

॥ নয় ॥



অমলকে একবার ডাকো তো পচার মা। অমল কি কলকাতায় নেই ?

ছোটদাদাবাবু তো কলকাতায় নেই।

কলকাতায় নেই ? তো সে কোথায় গেছে ?

বন্ধুদের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গেছে।

কাশ্মীর ? সঙ্গে শ্রীলাকে আর খোকাকে না নিয়ে ?

না। ওরা তো যায়নি।

শ্রীলাকে ডাকো তো একটু।

বৌদিকে ডেকে দিয়েই আমি বাজারে চলে যাচ্ছি। রবিবার হলেও দেরি করে বাজারে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না।

ঠিক আছে।

যুযুধান বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারেই বসেছিলো। সকালের জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে। শ্রীলা পর্দা ঠেলে এসে বললো, দাদা, ডেকেছেন ?

হ্যাঁ।

বোসো শ্রীলা। খেয়েছো ? খোকা কোথায় ?

নন্তুদের বাড়িতে গেছে খেলতে। ওখানেই দুপুরে খাবে। সীতাদি বলে পাঠিয়েছিলেন।

অমল নেই, খোকা তো প্রায়ই এ বাড়ি সে বাড়িতে যায়, তোমার একা লাগে না ?

একা ? নাঃ।

কী করে সময় কাটাও ?

রান্না করি। বই পড়ি। আপনি কলেজ স্ট্রীটের দিকে গেলে আমাকে একটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' (দু সেট), সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দূরবীণ' আর 'মানব জমিন' আর—

আর কি ? বলো।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' যদি এনে ছ্যান।

আরে যদি কেন। নিশ্চয়ই এনে দেবো। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত আমি পড়িনি। তোমার জানাশোনা কেউ কি পড়েছেন ?

হ্যাঁ চাঁপামাসী পড়েছেন। বলেছেন, গত তিরিশ বছরের মধ্যে এমন বই বাংলাসাহিত্যে নাকি পড়েনইনি।

যুযুধান সোজা হয়ে বসলো। দেবেশ রায়কে সে কখনও চোখে দেখেনি। লেখাও খুব বেশি পড়েনি। বললো, চাঁপা তো খুব ভালো পাঠিকা। চাঁপা যদি এ কথা বলে থাকে তো।…

এমন সময় দরজাতে কড়া নড়ে উঠলো।

আমি যাচ্ছি দাদা।

বলে, শ্রীলা দরজা খুললো। খুলেই, যুযুধানের দিকে ফিরে বললো, দাদা।

যুযুধান দেখলো শ্রীলার মুখ সাদা হয়ে গেছে।

সোম ঘরে ঢুকলো দরজা খুলে। দরাজ গলায় হেসে বললো, কেমন আছো তুমি শ্রীলা ! তোমার কথা সেদিন বলছিলাম তোমার ভাসুরকে। ভ্রাতৃবধূ পেয়েছে বটে শালা। আমার তো ভাইই নেই। থাকলে তোমারই মতো কাউকে আমি ঘরে আনতাম।

শ্রীলা নীরস গলায় বললে, বসুন।

আমি যাবো দাদা ?

যাবে কেন। এখানেই বোসো। আগে অমলের কথাটা ভালো

করে শোনা যাক। কোথায় গেছে বল তো? আর কে কে গেছে? বেড়াতেই যদি যাবে তো তোমাকে আর খোকাকে নিয়ে গেলো না কেন?

জানি না। বললো তো বেড়াতেই গেছে।

যুনী চিঠি লিখেছে, তাতে লিখেছে যে দূর থেকে মনে হলো যেন দরিয়াগঞ্জের 'মোতিমহল'-এ অমল এবং আরেকজন ছেলে, সঙ্গে তিন-জন মহিলা নিয়ে খেতে ঢুকছে। ও অফিস থেকে ফিরছিলো, বাস থেকে দেখেছে, তাই আর নামেনি। ভেবেছিলো দিল্লী যখন এসেছে তখন অমল যোগাযোগ একবার নিশ্চয়ই করবে। সাত দিনেও যখন যোগাযোগ করলো না, তখন লিখেছে, মনে হয়, নিশ্চয়ই ভুল দেখেছি। অমল নয়, অমলের মতো কাউকে।

না। কাশ্মীরে গেছে। দিল্লী হয়েই তো গেছে। দিল্লীতে কদিন থাকবারও কথা।

শ্রীলা বললো।

যুযুধান বললো, তুমি বড় আলগা দিয়েছো শ্রীলা। জোর খাটাও। তোমার সব জোর খাটাও।

শ্রীলা মাথা নিচু করে বললো, জোর যেখানে খাটে না সেখানে জোর কী করে খাটাই দাদা।

ঠিক কথা। সোম বললো।

জোর খাটিও না। তুমি ইগ্‌নোর করো পুরোপুরি। আমার পাড়ায় ওর কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো।

সেটা কি ভালো হবে সোম? তোর পক্ষেও।

আমার ভালোর কথা আমাকেই ভাবতে দে।

ছেলেগুলো তো ভালো নয়।

কে বলেছে? ভালো নয় তোকে কে বলেছে? বি. এ. পাশ করে বসে থেকে থেকে হেদিয়ে গিয়ে কোথাওই কোনো ওপেনিং না পেয়ে

রোজগারের জন্যে হয়তো কোনো পথ বেছে নিয়েছে। সেই জন্যেই কি তুই তাদের খারাপ বলবি ? মানুষের খারাপ-ভালো কখনও জীবিকা দিয়ে বিচার করতে নেইরে যুযুধান। যে-জীবিকা মানুষ পেটের খিদে বা নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই গ্রহণ করে, কোনো অন্য পথ খোলা না পেয়েই, শুধু সেই জীবিকা গ্রহণ করার কারণেই কোনো মানুষকেই খারাপ বলা যায় না। সমাজ যদি তাদের অন্য সম্মানজনক জীবিকা দিতে পারতো এবং সে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা অন্যতর জীবিকা গ্রহণ করতো তাহলে তুই খারাপ বলতে পারতিস তাদের।

যুযুধান চুপ করেই রইলো। কথা বললো না কোনো।

সোম বললো, শ্রীলা, আজকে আমি তোমার হাতের রান্না খাবো। আমাদের কুঁদঘাটে একেবারে কচি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়। দু কেজি নিয়ে এসেছি। রবিবারে তোমার ভাসুর রাঁধা মাংস না খেয়ে চলে এলো, তাই সপ্তমী সেদিন থেকেই প্যান্ প্যান্ করছিলো, এমনকি প্যাঙাটা পর্যন্ত। তুই যে কী গুণ করে এসেছিস তাদের, তা তুইই জানিস। যাও শ্রীলা। মাংসটা নিয়ে তুমি যাও।

সপ্তমী কে ? আর প্যাঙা ? শ্রীলা শুধোলো।

যুযুধানের মুখ কালো হয়ে গেলো। কী বলবে, ভেবে পেলো না।

সোম বললো, আমার অ্যাডাপটেড বউ আর অ্যাডাপটেড ছেলে। পরে শুনো যুযুর কাছ থেকে।

বলেই বললো, আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারো ? আর বাড়িতে কি পান আছে ?

পচার মার কাছে আছে। আসুক, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পাঠিয়ে নয়। তুমি নিজে নিয়ে আসবে। পান একটা বিশেষ বস্তু, আসামে পান-গুয়া কী করে নিবেদন করে মেয়েরা তা যদি দেখতে। যে জাত যত বেশি মাথা নোয়াতে জানে ব্যক্তিগত জীবনে, জাতীয় জীবনে তাদের মাথা ততই উঁচু হয়। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

আমরা বাঙালীরা ভালো করে হাত জোড় করে নমস্কার করতেই শিখলাম না, আমাদের কথা আর কী বলি !

শ্রীলা মাংসর পলিথিনের ব্যাগ হাতে চলে গেলে, যুযুধানকে সোম বললো, তোর জন্যে একটা বই এনেছি। পড়ে দেখিস।

কী বই ?

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। কী বলব ! বহুদিন এমন একটা বই পড়িনি বাংলাতে। পঁচিশ-তিরিশ বছর তো হবেই।

বলিস কী রে ! এই কথাই তো চাঁপাও বলেছে।

কে চাঁপা ?

আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে : দেখতে ভালো না, কালো, উঁচু উঁচু দাঁত, পয়সা নেই সুতরাং বিয়ে হয়নি। স্বার্থপরতা ও বাঙালী ছেলেদের গৌরবের স্যুভ্যেনির হয়ে সে এই গলিতেই রয়ে গেছে। কিন্তু এমন ভালো পাঠিকা বঙ্গভূমে বড় বেশি নেই। চাঁপা যদি কোনো বইকে ভালো বলে তো, আর কোনো প্রশ্নই থাকে না তার ভালোত্ব সম্বন্ধে।

সোম বললো, চল্ চাঁপাকে অ্যাডভাইসার করে আমরা একটা "বুক-ক্লাব" করি। কলকাতার মানুষ নিজেদের এতো বড় বুদ্ধিজীবী বলে মনে করে, আর্ট-কালচার গুলো খায় দু'বেলা অথচ কলকাতা শহরেই আজ অবধি একটিও "বুক-ক্লাব" গড়ে তোলা গেলো না। তা ভাবতেই খারাপ লাগে। যদি কখনও গড়ে ওঠেও তো দেখবি সেও আর এক 'দলবাজীরই' জায়গা হয়ে উঠেছে, ডান বা বাম গোষ্ঠীর বহু-শক্তির প্রজনন ক্ষেত্র। সেই "বুক-ক্লাব"-এ হয়তো দেবেশ রায়ের "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত"র নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হবে না। অথবা এই অত্যন্ত ভালো বইয়ের ভালোত্বকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি প্রচণ্ডতার সঙ্গে প্রকট করে তুলবে। বঙ্গভূমের নিরানব্বুই ভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই তো ভেস্টেড-ইন্টারেস্টের ব্রীডিং-প্লেস। যাই হোক,

এ সব প্রসঙ্গ থাক, আসল কথা হচ্ছে বইটা পড়ে দেখিস। আহা! একটি বইয়ের মতো বই! সৎ-সাহিত্য সব সময়েই সৎ-সাহিত্য সে বইয়ের লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন। সাহিত্য যে "আনন্দমেলা" এই কথাটা এদেশের কম্যুনিস্ট অ-কম্যুনিস্ট সবাই যে কবে বুঝবে? সাহিত্যকে কবে এই সব ভোটরঙ্গর ভণ্ডামির জমি থেকে মুক্ত করবে? তা ঈশ্বরই জানেন। বইটা পড়ে দেখিস যুযু, তোর নিজের লেখাকে একদম জোলো বলে মনে হবে।

আমি আবার লেখক নাকি! নিশ্চয়ই পড়বো। তার আগে শ্রীলাকে পড়াবো। ও তো বলছিলো বইটার কথা।

যারা ভালো পড়ুয়া, তাদের অধিকাংশই মেয়ে। এবং দুঃখী মেয়ে। কেন বল তো এমন হয়? সুখী মেয়েও অবশ্য আছেন। সোম বললো।

ঠিক জানি না। বহির্জগত যতই বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, অন্তর্জগৎ ততই খোলামেলা হতে থাকে বোধহয়। অন্তর্মুখী মানুষ ছাড়া সাহিত্য-সঙ্গীতের রসাস্বাদন করবে কে বল? সে কারণেই এই আমাদের বঙ্গ-ভূমে কী বাংলাদেশে মেয়েরাই চিরদিন ভালো পাঠক, ভালো শ্রোতা, ভালো বোদ্ধা। এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

তুই অমলের কথা কি বলছিলি? সোম বললো।

শুনলি তো সবাই। যুনা লিখেছে, অমল আর তার এক বন্ধুকে দেখেছে দরিয়াগঞ্জ-এর মোতিমহলএ ঢুকতে তিনজন মহিলার সঙ্গে। দিল্লীর মোতিমহলে।

হুঁ। আমি অমল-এর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবো।

নিজেকে বাঁচিয়ে। যার সঙ্গে কথা বলবি ভাবছিস, দেখবি, সেই হয়তো গেছে অমল-এর সঙ্গে।

দেখবো। সেদিন আমার বাড়ি কেমন লাগলো বল যুযু?

কী ভালো লেগেছে, কী বলব! তুই একটা ওরিজিনাল মানুষ

সোম। টু-হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি মানুষ। তুই কিন্তু তোর চাকরি যাওয়ার ব্যাপারটা বলিসনি। মানে কারণটা।

বলার বিশেষ কিছু নেই। শুনেই বা কি করবি? আমার যে বন্ধুর কথা বললাম, সে ডিসেম্বর থেকে "সিক্" রিপোর্ট করে ছুটি নিলো। তার ওয়ার্ডের চার্জ আমাকে নিতে হলো। ও বললো, সোম, তোর কোনো চিন্তা নেই।

আমি বললাম, চিন্তা নেই বলছিস কী করে? দেড়শো টাইম-বারিং ম্যাটার আছে তোর ওয়ার্ডে। আমার ওয়ার্ডে তো দুশো আছে।

সে বললো, তুই পর পর রোজ কেস, পেনাল্টি ইত্যাদির হিয়ারিং ফিক্স্ করতে থাক। আমি বাড়ি বসে তোকে অর্ডার লিখে দেবো। তুই শুধু অফিসে টাইপ করিয়ে সই মারবি।

আমি বললাম, তুই আমার চাকরিটা খাবি না নিশ্চয়ই। কারণ, আমার ওয়ার্ডেও দুশো টাইম-বারিং ম্যাটার বাকি। ও যে সৎ নয় তা আমি জানতাম। আজকাল অসৎ হওয়া দোষের বলেও মনে করি না আমি। অসততাকে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত মানুষের গলায় ফাঁসীর মতো পরিয়ে দিয়েছে এই বিয়াল্লিশ বছরের স্বাধীনতা আর নেতৃত্বর রকম। রাজ্যে কী কেন্দ্রে। কিন্তু ও যে আমাকে মারবে সেটা ভাবিনি।

ও বলেছিলো, কে কার চাকরি খায় রে এই ভারতবর্ষে। গভর্নমেন্টের চাকরি হওয়াটা কঠিন, যাওয়া তার চেয়েও কঠিন।

তারপর?

তারপর ও অ্যাসেসীদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে কারো কাছে পাঁচ, কারো কাছে দশ কারো কাছে বিশ বানিয়ে নিয়ে অ্যাসেসীদের দিয়েই তাদের সুবিধেমতো অর্ডার ড্রাফট করিয়ে রাতে বাড়ি ফিরলে আমাকে দিতো। বলতো, কাল টাইপ করে সই করে ডিম্যাণ্ড নোটিস, চালান, বা রিফাণ্ড অর্ডার ভাউচার সই করে পাঠিয়ে দিস। আমি যখন অফিসে থাকতাম তখন সে আমার সতী-সাবিত্রী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতো।

মাইনের টাকা, আর ঘুষের টাকা! জানি না, কিন্তু আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েরাই যার টাকা আছে তাকেই বড় বলে জানে। উইমেনস্ লিব্-এর প্রবক্তারা যাই বলুন আর তাই বলুন।

তারপর ?

তারপর আর কী! বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং যা করেছেন গত তিন যুগে আর কেউই তা করেনি। চাকরি, সরকারী চাকুরেদের গেছে সব সেই আমলেই। তবে আমার চাকরি গেছে আমারই মূর্খামির জন্যে বিশ্বনাথ-প্রতাপের খড়্গার জন্যে নয়। বন্ধুকে বিশ্বাস করার জন্যে। তার জন্যে দায়ী তো বিশ্বনাথপ্রতাপ নন। আমার সঙ্গে আরো অনেকেরই চাকরি গেছে। বিভিন্ন লেভেল-এর আমলাদের মধ্যে কারো কারো দুর্নামও ছিলো। তবে ইনএফিসিয়েন্সী, ব্যাড পাবলিক রিলেশান-এর জন্যও বোধহয় গেছে কারো কারো। আমারটা গেছিলো অসততার অভি-যোগে। দুঃখটা সেটাই। তবে মজা এই যে, আমাদের ইনকামট্যাক্সে যারা সত্যিকারের ডাকাত তাদের নাম কেউই জানে না। জাহাজের কারবারীরা সতীপনার সার্টিফিকেট পায়, সতীত্বহীন হয় আদার ব্যাপারীরা। আমিও তাই চাকরি হারালাম। এইখানেই আমার সঙ্গে শ্রীলার মিল আছে। মুনিয়ার দুঃখ তাই বুঝি। অপারগতাও।

তারপর ?

তারপর আর কি? ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে। চাকরিটা অমন করে না গেলে এই সংসারকে জানা হতো না। এই চাকরি যাওয়ার পিছনেও আমার বন্ধু। সে নিজে অর্ডার ড্রাফট করে আমাকে দিয়ে সই করাতো যেমন, পরক্ষণেই নিজেই বেনামে ভিজিলেন্স-এ চিঠি লিখতো। আমার টাইপিস্টকে একদিন ভিজিলেন্স-এর লোক ডেকে নিয়ে ধমক-ধামক দিয়ে তার স্টেটমেন্ট নিলো যে ঐ অর্ডারগুলির একটা অর্ডারও আমার লেখা নয়, অ্যাসেসীরা যা টাইপ করে এনেছে

তাই হুবহু টাইপ করে দেওয়া। আমাকে বাঁচাতে ও মিথ্যা বলতেও পারতো। কিন্তু বলেনি। ওকেও মোটা টাকা দিয়ে রেখেছিলো আমার বন্ধু। পার-অর্ডার পাঁচশো টাকা। এবং তার বৌ-এর সঙ্গেও আমার বন্ধুর অ্যাফেয়ার ছিলো। টাকাই এখন সংসারের সবচেয়ে দামী জিনিস বুঝলি যুযু! চুরি কর, খুন কর, রেপ কর, মার্ডার কর, পার পেয়ে যাবি।

তারপর ?

তারপর আর কিছু নেই। "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত"টা পড়ে ফ্যাল। ধরলে আর ছাড়তেই পারবি না।

পচার মা বাজার থেকে ফিরলো। যুধুধান বললো, পচার মা একটু পান দিও আমার বন্ধুকে। জর্দাও।

পচার মা হেসে বললো, দামী জর্দা তো নেই।

তুমি যা দেবে তাই দামী বলে মেনে নেবো পচার মা। যা আছে, তাই দাও। হেসে বললো সোম।

শ্রীলা নিজে হাতে চা নিয়ে এসে বললো, সোমদাদা, মাংস কি একটু চাখবেন ?

নাগো! তুমি যা রেঁধে দেবে তাই অমৃত ভেবে খাবো। এখন বলো, তুমি কবে তোমার ভাসুরের সঙ্গে আমার বাড়ি যাবে ? সারাদিন কাটাবে ?

দাদা যেদিন বলবেন। শ্রীলা বললো।

সোম বললো, সুমিত্রার মতো ভাদ্রবৌ পেয়েছিস রে তুই শালা। যদিও তুই রামচন্দ্র নোস !

হাসলো যুযুধান।

শ্রীলা বললো, আমি এখন যাই। বলেই চলে গেলো।

হঠাৎই সোম বললো, আজকে একটু ভডকা খেতে মন করছে। আনাবো ?

যুযুধান বললো, আমার বউ যদি থাকতো তবে তোর মতো বন্ধুর জন্যে তার সামনে বসেই খেতাম। আমাদের গলিটা পুরোনো। সব কিছুকেই এখনও প্রাণপণে আঁকড়ে আছে, তেমন ভালো এবং নতুন কিছুই জড়িয়ে-ধরার পায়নি বলেই হয়তো। তাছাড়া, ঘরে আমার ভাদ্রবৌ। তাকে জিগেস না করে এসব না করাই ভালো। তার চেয়ে চল্ না বার থেকে খেয়ে আসি। কাছেই পাঞ্জাবীদের মদের দোকান আছে। অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশানেও যেতে পারিস।

দুস্ শালা। এই বাড়িতে ঠাণ্ডায় শান্তিতে বসে খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো ঐটুকুই। ছেড়ে দে।" নেশাগ্রস্ত হতে বা নেশা-তাড়িত হতে তো আমার জীবনই যথেষ্ট। অন্য নেশা না হলেও চলবে।

তুই গ্রেট লোক সোম। তুই মদ খাস অথচ নেশা করিস না।

না করি না।

বাঃ!

যুযুধান বললো। কিন্তু তুই তো খেতে চাইলি, খাবি না? আমি শ্রীলাকে জিগেস করে তারপরই আনাই।

প্লীজ না। মুনিয়া অবশ্য নিজেই তার আয়াকে দিয়ে আমার জন্যে ভডকা আনাতো; ওকে কিছু বলিস না। পুরোনো কথা মনে করে ও নতুন করে লজ্জা এবং হয়তো দুঃখও পাবে। ভয়ও পেতে পারে। আমার এমন কিছু প্রয়োজন নেই। আজ এখানে এসেছি তোরই কথামতো শুধু ওকে ভয়মুক্ত করতে। ও বড় ভালো মেয়ে। ও তো জানে না যে এ জীবনে আমার দ্বারা কারোই ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া ও যে আমার তোর চেয়েও অনেকই ভালো।

গলা নামিয়ে সোম বললো, যুযুধান! ও যদি প্রস্ হয় তাহলে আমরা ওর চেয়ে অনেকই বড় প্রস্। কান খুলে শুনে রাখ্। এ কথা বোধহয় বলেও ছিলাম সে রাতে।

এই সময় পচার মা এসে বললো, দাদাবাবু, পান।

আমার বন্ধুকে দাও। আমি একটা সাদা পান খাবো।

খেতে বসে শ্রীলা বললো, সোমদাদা ! আপনি ভালো করো খান। কেমন হয়েছে মাংসটা ? আসলে এরকম মাংস তো আমাদের এদিকে পাওয়া যায় না। মাংস ভালো হলে রাঁধুনীর গুণ লাগে না।

সোম বললো, মাংস তো অনেক পাড়াতেই ভালো পাওয়া যায়। কিন্তু ভালো রাঁধুনি সব জায়গায় কি পাওয়া যায় ? অমৃতের মতো রেঁধেছো তুমি ! কী কী দিয়েছিলে বলো তো মাংসে ?

যা সকলেই দেয়। তার সঙ্গে একটু সুপুরী, একটুকরো দইয়ের ভাঁড়-ভাঙ্গা, পেঁপে, দই বেশি করে, এই। আর কী !

এই সব মুসলমানী ব্যাপার তুমি কেথেকে শিখলে শ্রীলা ? আমিষ রান্নার ব্যাপারে মুসলমানদের কোনো জবাব নেই। সত্যিই ভোগী জাত, বাঁচতে জানে ওরা। আমাদের ডিপার্টমেণ্টর বন্ধুদের বাড়িতে ঈদ আর মুহাব্বাসে যে খানা খেয়েছি তা মুখে লেগে আছে।

আমার ········

বলতে গিয়েই থেমে গেল শ্রীলা।

সোম বললো, বুঝেছি বুঝেছি। তোমরা তো বহুদিন বিহারে ছিলে। সেখানে তোমার বাবার তো বহু মুসলমান বন্ধু-বান্ধব তাই না ? আমাকে বলেছে যুযুধান।

অবাক হয়ে শ্রীলা যুযুধানের মুখের দিকে চাইলো।

যুযুধান ভ্রাতৃবধূকে আশ্বস্ত করে, বাঁ হাঁতের আঙুল মাথার বাঁদিকে কানের পাশে টেম্পলএ ঠেকিয়ে আঙুলটা ঘুরিয়ে দিয়ে মুখ আড়াল করে হাসলো।

সোম ওদের দুজনকেই অপদস্থ করে বললো, জানোই তো আমি পাগল। আমার কথার কোনো দাম নিও না, দাম দিও না। ভারী আনন্দ হলো আজকে। আরেকদিন মাংস নিয়ে আসবো, অমল যেদিন থাকবে। সেদিনও এমন করেই রেঁধো।

খাওয়া-দাওয়ার পর যুযুধান বললো, এই গরমে কোথায় যাবি? শুয়ে থাক আমার কাছে। তোকে কী আর বলবো। তোর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার।

সোম পান চিবোতে চিবোতে বললো, হ্যাপী তো? কী রে! আমার মাথায় তো ছিট আছেই, সকলেই বলে, কিন্তু মুনিয়াকে তুই বলিস যে আমি রিয়্যাল উন্মাদ। তাহলে ও এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আমার কোনো কথাই তোর এবং অন্য কারোরই ধর্তব্যর মধ্যেই নয়। কখনওই। মুনিয়া নিশ্চিন্ত হবে।

ঠিক সেই সময়েই যুযুধানের ঘরের পর্দার আড়াল থেকে চুড়ির রিন-ঠিন এবং শ্রীলার গলা শোনা গেলো।

দাদা!

যুযুধানের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো। শ্রীলা নিশ্চয়ই ওদের কথা শুনেছে।

খাটে ও আধশোয়া হয়ে বসেছিলো। উঠে বসে বললো, এসো। এসো। ভিতরে এসো শ্রীলা।

শ্রীলা, যুযুধান বাড়ি-থাকাকালীন ওর শোবার ঘরে কমই ঢোকে। যদিও ওর অনুপস্থিতিতে ওর মেয়েলি মঙ্গলপরশে সব কিছুই ঠিক-ঠাক গোছ-গাছ করে রাখে। একজন মেয়ে যে একটি বাড়িতে কত বড় প্রয়োজন, কত বড় সহায়ক সে বাড়ির শ্রীর, সৌন্দর্যর, শান্তির তা যুযুধান অফিস থেকে ফিরলেই বুঝতে পারে। যেদিন শ্রীলা তার ঘরে আসে না গোছ-গাছ করতে সেদিন ঘরে ঢুকেই ও বুঝতে পারে যে, কোনো কারণে শ্রীলা আসেনি। কাউকেই বলে দিতে হয় না তাকে। শ্রীলা ভেতরে এসে দাঁড়ালো। তার দু'চোখে জল টলটল করছে।

বড় অপরাধী লাগলো যুযুধানের নিজেকে। সত্যটা, এমনিতেই অসহ্য ছিলো; কিন্তু সেই সত্যটা চাপা দেওয়ার চেষ্টাতে সত্যটা আরো অনেকই বেশি প্রকটভাবে নগ্ন হয়ে পড়লো।

সোম মাথা নীচু করে রইলো।

যুযুধান দু'বার গলা খাঁকরে বললো, বলো, শ্রীলা।

শ্রীলা যুযুধানকে কিছু না বলে, সোমকে বললো, আপনি একটু বাইরে আসবেন ?

আমি ? কেন ? কী হলো ?

কথা আছে।

যুযুধান কোথায় লুকোবে নিজেকে ভেবে পেলো না। দু'হাতে বালিশটা তুলে নিজের মুখে চাপা দিলো।

সোম শ্রীলার সঙ্গে বাইরে গেলো। সেও গলা খাঁকরে বললো মুনিয়া ক্ষমা করো আমাকে। যুযুধানের মতো ভাসুর হয় না। ও সব জানে। জানে বলেই, ব্যাপারটাকে চিরদিনের মতো মুছে দিতে চায় তোমার জীবন থেকে। আমিও বলেছি তোমার তো······

ব্যানার্জি সাহেব··· · ···

তোমার তো কোনো············

ব্যানার্জি সাহেব, দাদাকে আপনিই খবরটা দিন।

কি খবর ?

আমি পারবো না দিতে। আপনার বন্ধু, আপনিই দিন।

কী খবর ? সেটা তো বলবে !

আমাদের বাড়ির ফোন খারাপ। আজ রবিবার, দাদার অফিসও বন্ধ। তাই পাশের বাড়ির হরিবাবুকে ফোন করেছে যবন, দিল্লী থেকে, ফোন ধরে আছে।

কি খবর ?

যুনীদি কাল দুপুরে জনপথ-এ গাড়ি চাপা পড়েছিলেন। ওয়েস্টার্ন কোর্ট আর ইস্টার্ন কোর্টের মাঝে। কলেজ ছুটির পর কেনা কাটা করতে গেছিলেন জনপথ-এ। ওঁর আজ কলকাতায় রওয়ানা হবার

কথা ছিলো। দাদাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যেই দাদাকে আগে জানাননি। শান্তিনিকেতনে যাবেন বলেই আসছিলেন নাকি সাত দিনের ছুটি নিয়ে।

তারপর ?

আধঘণ্টা আগে মারা গেছেন যুনীদি। এখনও সময় আছে। দাদা যদি বিকেলের ফ্লাইট ধরে দিল্লী পৌঁছতে পারেন·········

সোম একমুহূর্ত ভাবল। তারপরই বললো, যে ফোন করেছে তাকে বলে দাও যে যুযুধানের জ্বর। যেতে পারবে না।

বলে দেবো ? দাদাকে জিগেস না করেই ?

হ্যাঁ। বলে দাও। আমি বলছি। ও গিয়ে কি করবে ? ও যা নরম মনের মানুষ।

ঠিক আছে। ভাগ্যিস এই সময়ে আপনি ছিলেন। নইলে আমি কী যে করতাম !

গলা নামিয়ে সোম বললো, তুমি ঠিক থেকো। তোমারও তো দিদি। তোমার দাদাকে আমি দেখছি।

সোম যখন ঘরে ঢুকলো তখন যুযুধান বললো, তুইই আমার জীবনের শনি। তোর সঙ্গে কেন যে দেখা হলো এতো বছর পরে। আমার সুখের সংসার তুই ভেঙে দিলি। কী বললো রে শ্রীলা ?

যুযুধানের বেডসাইড টেবলে যুনীর একটা ছবি ছিলো। লেডি-শ্রীরাম কলেজের সামনে বই খাতা হাতে দাঁড়ানো। ছবিটি অনেকদিন আগে কিন্তু ঐটেই বাঁধিয়ে রেখেছিলো যুযুধান। কারণ যুনী সবচেয়ে বেশি যুনী ঐ ছবিটিতেই। চিরকালের যুনী।

সোম বললো, এ কার ফোটো ?

যুনীর। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তবে কবে যে, তা কে জানে ? প্রত্যেক ফুলের জীবনে যেমন একটি সময় আসেই সব থেকে বেশি করে ফোটবার, প্রত্যেক নারীর জীবনেও তাই। প্রস্ফুটিততম

হবার পর তার উপরে বিকেলের ছায়া পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। তখন মন-ফোটার বেলা শুরু হয়, আর শরীর মলিন হবার। এই ফোটোটা যখনকার, তখন যুনী থীসিস্ করছিলো।

ফোটোটা হাতে তুলে নিয়ে সোম বললো, এই মহিলা ?

বাঃ। এই তো যুনী। দিল্লীতে থাকে। শ্রীলার সম্বন্ধ তো ওই করেছিলো। তোকে বলিনি যুনীর কথা ?

মুখে বলিসনি। কিন্তু তোকে দেখে বুঝতাম যে তুই কারো প্রেমে পড়ে আছিস গভীরভাবে। প্রেমে না পড়ে থাকলে কারো মুখ অমন ঔজ্জ্বল পায় না।

যুযুধানের মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সোম বললো, ফোটো দেখেই আমি প্রেমে পড়ে গেছি।

যুযুধান গৌরবের হাসি হাসলো। পরক্ষণেই তার মুখের হাসি নিভে গেলো। বললো, শ্রীলা কি বললো, তাই বল্।

ও কিছু না। তোর ভয় নেই। ও আমাদের কথা শোনেনি। আমাকে বললো, অমলের সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিতে। ওর ধারণা অমল ড্রাগ-পেড্‌লার হয়েছে। অন্য স্মাগলিং-এর কাজেও আছে। যে-কোনোদিন পুলিশের হাতে পড়বে, নয়তো খুন হয়ে যাবে।

বলিস কী রে !

যুযুধানের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। বললো, আমার মনও তাই বলছিলো। নইলে এতো ফুটুনি করে কি করে ! দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোয়। সকালে একবার বেরোয়, তাও কোনো কোনোদিন। বিকেলে চা খেয়ে বেরোয় ছটা নাগাদ, তাও নটা-দশটা নাগাদ চলে আসে।

তুই ভাবিস না। আমি খোঁজ নেবো। এবং দেখি কী করা যায়।

যুযুধান বললো, মা নাম রেখেছিলেন যুযুধান, কোলবালিশ-পেটাপেটি করতাম বলে। বোনটা তো মরেই গেলো। ভাইও দু'দিনের জ্বরে এনকেফেলাইটিস্-এ। সেও পনেরো কুড়ি বছর হলো।

এখন আমি আর অমল। আমার নিজের কারণে কারো সঙ্গেই কোনো যুদ্ধ নেই অথচ গ্যাখ সারাটা জীবনই অন্যর কারণে যুদ্ধ করে যেতো হলো।

সোম বললো, যুদ্ধ, সকলেই করে, কারো যুদ্ধ, যাত্রার যুদ্ধর মতো, চিৎকার, চেঁচামেচি, রাংতা-মোড়া তলোয়ারের ঠন্ঠন্। কারো যুদ্ধ তোর মতো, নীরবে নির্জনে, লোকের চোখের আড়ালে। তবে যুযুধান নাম বোধহয় আর কারো নেই। মাসীমার ওরিজিনালিটি ছিলো।

বলেই বললো, এই যুনী মেয়েটিকে বিয়ে করছিস না কেন ?

এদিকে তো চাকরি জোটাতে পারছি না। আমি দিল্লী যেতে পারতাম চেষ্টা চরিত্তির করে তবে স্টেট-গভর্নমেন্টের আর কটা চাকরি দিল্লীতে আছে ? আমি তো আই. এ. এস. বা ডাব্লু. বি. সি. এস. ও নই !

যুনী কি শীগগিরই আসবে কলকাতায় ? এলে, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিস।

নিশ্চয়ই দেবো। তোর কথা লিখেওছি ওকে। তোর কথা, সপ্তমীর কথা প্যাণ্ডার কথা।

এবার চল্ ওঠ। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে পায়জামাটা পরে নে। তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। যোধপুর পার্কে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে দেবো। কল্যাণ মজুমদার।

দূর। রবিবারের দুপুরে আমি ঘুমোই। নে তো। তুইও শুয়ে পড়। চল্লিশ হয়ে গেছে তো। শরীর একটু আরাম চায়।

না রে ওঠ্। তোকে যেতেই হবে একবার।

আমি কোথাওই যাচ্ছি না।

তাহলে আমিই উঠি। আমার যেতেই হবে।

এই রোদে যাবি ? বড় চড়া রোদ।

জীবন মানেই তো রোদ। ছায়া কোথায় পাবি যুযুধান ?

আমি চলি রে।

দরজা খুলে যুযুধান বললো, চল্ তোকে বাসে চড়িয়ে দিয়ে আসি।

সোম বললো, তাহলে তো যেতেই পারতিস। তুই ঘুমো। একটা দিনই তো! আমার মতো ভ্যাগাবণ্ড তো তুই নোস যে রোজই ছুটি;



॥ দশ ॥



শ্রীলা অনেক কেঁদেছিলো। পচার মাও কম কাঁদেনি। কিন্তু যার সবচেয়ে বেশি কাঁদার ছিলো সেই যুযুধানই পাঁচটা অবধি ঘুমিয়েছে। তারপর পচার মাকে ডেকে চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। প্রতি রবিবারেই যেমন যায়। ফেরবার সময় খোকার জন্যে কিছু না কিছু খাবার কিনে আনবেই।

শ্রীলা ভাবছিলো, আশ্চর্য এই সংসার! নিজের ভাই অমলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক সবচেয়ে কম অথচ শ্রীলা আর খোকাই যুযুধানের অনেক কাছের মানুষ। এতোদিন যুনীদিদি ছিলো। সেও চলে গেলো! যুযুধানের স্বভাব দেখে মাঝে মাঝেই শ্রীলার মনে হয় অমলের বদলে দাদা তার স্বামী হলে কতো ভালো হতো। অমন স্বামীর জন্যে যে-কোনো মেয়ে সবকিছুই দিতে পারে। অমলের আপন দাদা বলে মনেই হয় না। অমল জীবনে কোনো একটি বইও পুরো পড়েনি। শ্রীলা একরকম আর অমল অন্যরকম।

পচার মা বললো, কবে কাজ করবে গো দিদি?

তিন দিনে তো করার কথা। কিন্তু পোস্টমর্টেম করে ডেডবডি কবে হাতে পাবে তার উপরে তো। সৎকার হলে না কাজ। দেখলেনা, অপরেশদার বেলাতে কি হলো। অ্যাক্সিডেন্টে মরলে নানা হ্যাপা। ঈশস্। যুনীদিদিটা সত্যিই চলে গেলো। ভাবতেও পারছি না আমি। আমাদের কাছে সে আপনেরও বেশি ছিলো।

সন্ধের পর যুযুধান যখন ফিরলো তখন শ্রীলা নিজেই নিচে নেমে দরজা খুললো। আজ কোথায় গেলেন দাদা কে জানে। আত্মহত্যা-টত্যা করবেন না তো!

ওর মুখে চেয়েই মনে হলো যুযুধানের যে, কান্নাকাটি করেছে।

বললো, অমল ফিরেছে নাকি?

না তো!

এই নাও! গুপ্ত-ব্রাদার্সের ভেলপুরী এনেছি তোমার জন্যে।

দরজা না-লাগিয়েই শ্রীলা বললো, আমি খাবো না দাদা। বলেই, ও একটি সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ করেই চুপ করে গেলো।

ও কী। তোমার চোখ মুখ ফোলা কেন? কি হয়েছে শ্রীলা? সোম কি তোমাকে কিছু বলেছে? অপমানজনক কিছু বলেছে? রাসকেল্‌টা তো আমাকে কিছুই·········

শ্রীলা অবাক হয়ে বললো, উনি আপনাকে কিছু কি বলেননি? আমি যা বলতে বলেছিলাম।

আমাকে? কই? নাতো!

কী সাংঘাতিক লোক!

বলতে বলতেই, দরজার পাল্লা ঠেলে সোম একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলো।

শ্রীলা আক্রমণাত্মক গলায় বললো, আপনি দাদাকে বলেননি?

বলব! বলব! সবকিছুরই বলার সময় থাকে। অত তাড়া কিসের?

কী, ব্যাপারটা কি? যুযুধান একটু অবাক হয়ে বললো। এমন কী কথা যা শ্রীলা বলতে পারে না, সোমের তাকে বলতে হবে, অথচ শ্রীলা অত্যন্তই মথিত।

সোম পকেট থেকে একটা টিকিট বের করলো ট্রেনের। তারপর কারো প্রশ্নর অপেক্ষা না করেই চেয়ারে বসে বললো, যুযু, তোকে পরশু দিল্লী রওয়ানা হতে হবে ট্রেনে। আর আমি যাচ্ছি কাল সকালের ফ্লাইটে, প্লেনে। ভোর ছটায় ফ্লাইট। রাতটা তোর এখানেই থাকবো। সকালে ট্যাক্সি পেতে সুবিধে হবে।

কী ব্যাপার ? হতভম্বর মতো যুযুধান শুধোলো।

তারপর শ্রীলার দিকে অসহায়ের মতো ফিরে বললো, কী ব্যাপার ? যবন আন্নুর কি কিছু হয়েছে ? কি ? .....

শ্রীলা দুদিকে ঘাড় নাড়লো। দু চোখে জল নিয়ে।

তবে ? কোনো খারাপ খবর ? কি ?

শ্রীলা, আমাদের জন্যে দু গ্লাস জল এনে দাও তো। সোম বললো।

কী হয়েছে রে ? সোম ?

জলটা খাই। বলছি। বড়· ঘোরাঘুরি করতে হলো তো সারা দুপুর। তোর এখান থেকে বেরিয়ে গোপেনদার বাড়ি গেলাম, টাকা ধার করে আই. এ. সি. তে গিয়ে আমার টিকিট কাটলাম। তাও বলে কিনা, একশো-বত্রিশ নাম্বার চান্স। সেখান থেকে কল্যাণ মজুমদার সাহেবকে তাঁর বাড়িতে ফোন করিয়ে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে তারপর কোনোক্রমে ভি. আই. পি কোটা থেকে এই টিকিট পেলাম। তারপর তোর টিকিট। তাও আবার একজিক্যুটিভ ক্লাস। লোকে দেখলে ভাববে, চাকরিটা ন্যায্য কারণেই গেছে। তারপর বাড়ি গেলাম ওদের বলে আসতে। তিন চারদিন থাকবো না। একা থাকবে ওরা থাকবে ওরা। ঐ প্যাঙাটাকে নিয়েই চিন্তা।

এই যে জল। শ্রীলা ট্রেতে বসিয়ে জল এনে বললো।

জল তুলে নিয়ে সোম বললো, তুই খাবি না ? খা।

ওর এমনই হাব-ভাব যেন বাড়িটা সোমএরই। যুযুধানই অতিথি।

যুযুধান ভাবছিলো।

গ্লাসটা তুলে যুযুধানও খেলো জল।

গ্লাস নামিয়ে রেখে সোম বললো, আমরা যে কত সুখে আছি, থাকি, তা আমরা বুঝতে পারি যখন কোনো দুঃখ বা মানসিক ঝড় বা

আঘাত এসে আমাদের শান্তিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। আমি বোধহয় তোর পক্ষে খুবই অপয়া যুযু। আমি······

কী হয়েছে বলবি কি না বল ?

বলছি. বলছি শ্রীলা পচার মাকে বলো না একটু চায়ের জল চড়াবে আর তুমি এখানে এসে বোসো।

যুযুধান তীব্র চোখে চেয়েছিলো সোম-এর চোখে।

শ্রীলা ফিরে এলে সোম বললো, যুনী আমাদের ফেলে চলে গেলো রে।

কোথায় গেলো ? চমকে উঠে যুযুধান বললো।

সোম বললো, আমার স্ত্রীর যাওয়ার চেয়ে এ যাওয়া অনেক ভালো, অনেকেই সম্মানের। জনপথ-এ রাস্তা পার হবার সময় গাড়ি চাপা পড়ে কাল। আজ দুপুরে আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখনই সে চলে যায়। তাই তো শ্রীলা ?

ভাবাবেগহীন ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট গলাতে সোম বললো।

যুযুধান দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো। মাথা নুইয়ে নিলো। চিবুক ঠেকে গেলো বুকে।

সোম চোখ দিয়ে শ্রীলাকে ইশারা করলো। শ্রীলা যুযুধানের পায়ের কাছে এসে মাটিতে বসে যুযুধানের হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সোম বললো, যুযুধান ! তুই পুরুষ মানুষ। শ্রীলাকে সামলা আগে। কেঁদে কেঁদে চোখমুখের অবস্থা কি করেছে দেখছিস ?

যুযুধান চোখ থেকে হাত সরিয়ে শ্রীলার মাথায় রাখলো। সে কাঁদছিলো না। কিন্তু দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছিলো।

শ্রীলা কাঁদতে কাঁদতে বললো, শান্তিনিকেতনে যাবে বলেই আসছিলো কলকাতায়। আজ রওয়ানা হয়ে আসতো। কাল শনিবার, কলেজ ছুটির পর কনট-সার্কাসে বাজার করতে গেছিলো। আপনাকে সারপ্রাইজ দেবে বলে, জানায়নি।

যুযুধান বললো, তোর টিকিটটাই আমাকে দে।

না। এখন গিয়ে তুই কি করবি? পোস্টমর্টেম হবে? কবে ছাড়বে বডি। ভালোবাসার জনকে কখনও অমন শেষ দেখা দেখতে নেই। তোর শোওয়ার ঘরের বেডসাইড টেব্‌লে যে যুনী আছে, সেই থাক তোর কাছে চিরদিন। আমি যাচ্ছি, এই দুঃসময়ে যবনের পাশে থাকার জন্যে, পোস্ট-মর্টেম, দাহ, কাজের বন্দোবস্ত সবই করতে হবে তো! তুই আমাকে একটা লিস্ট বানিয়ে দে। দিল্লীতে তোর জানাশোনা কে কে আছেন, কাজে, তাঁদের বলতে হবে তো। যবনের কাছে বাকি লিস্টও পাবো।

একমুহূর্ত থেমে বললো, যবন বিয়ে করেছে?

না। একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে ভালোবাসে। ভারী চমৎকার মেয়ে। অনুরাধা। শ্রীলা বললো।

ওদের বিয়েরও বন্দোবস্ত করে আসবো এবারে। তুই এসে পৌঁছো? অনুরাধার মা বাবার সঙ্গে কথা বলে আসবো। ওঁরাই তো এখন যবনের গার্জেন হবেন।

সোম নিজের মনেই আরো অনেক কিছু বলে যেতে লাগলো, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, যেন যুনীকে ও যুযুধানের চেয়েও বেশি বেশি চিনতো, চিনতো যবন আর অনুরাধাকেও। ঐ শোকের মধ্যেও যুযুধান একবার সোম-এর রোদে-পোড়া লম্বা তামাটে চেহারার উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকালো। ভাবলেশহীন মুখ। ও ভাবছিলো, নামটা ওর যুযুধান বটে কিন্তু আসল যুদ্ধ করতে এসেছে এখানে সোমই।

সোম ছিলো বলেই বোধহয় যুনীর চলে যাওয়াটার প্রভাব পুরো পড়লো না নিজের উপরে। আশ্চর্য। জীবনের ঠিক যে-সময়ে সবচেয়ে বেশি করে বাঁচতে ইচ্ছে করছিলো, "বাঁচার মতো বাঁচার" ইচ্ছেটা তীব্রতম দীপ্তি পেয়েছিলো; ঠিক সেই সময়েই···

সোম যেন ও মনের কথা বুঝতে পেরেই বললো, বুঝলি যুযু, man proposes ; God disposes.

সোম-এর দিকে চেয়ে যুযুধান চুপ করে থাকলো, কয়েকমুহূর্ত, তারপর বললো, তুই চা খাবি বলছিলি তো ?

হ্যাঁ। শ্রীলা, যাও একটু চা করো আমাদের সকলেরই জন্যে। আর কিছু আমরা আজ কেউই খাবো না। খোকাকে খাইয়ে শুইয়ে দাও গিয়ে। একমাস নিরামিষ। যুযুর সঙ্গে যুনীর বিয়েটা হয়ে গেলে তো তাইই হতো !

তাইতো ! বলে, শ্রীলা উঠে গেলো।

সোম বললো, আজ সারারাত তুই যুনীর গল্প বলবি আমার কাছে আর আমি শুনব। ভোর চারটেতে আমাকে তোর এখান থেকে বেরোতে হবে, দমদম-এ যাওয়ার জন্যে।

—

